

মরণের ডঙ্কা বাজে

চাঁদপাল ঘাট থেকে রেঙ্গুনগামী মেল স্টীমার ছাড়চে। বহু লোকজনের ভিড়। পুজোর ছুটির ঠিক পরেই।
বর্মাপ্রবাসী দু'চারজন বাঙালী পরিবার রেঙ্গুনে ফিরচে। কুলীরা মালপত্র তুলচে। দড়াদড়ি ছোঁড়াছুঁড়ি, হৈহৈ।
ডেকযাত্রীদের গোলমালের মধ্যে জাহাজ ছেড়ে গেল। যারা আত্মীয়-স্বজনকে তুলে দিতে এসেছিল, তারা তীরে
দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগলো।

সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসেনি। কারণ কলকাতায় তার জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই! সবে
চাকরিটা পেয়েচে, একটা বড় ঔষধ-ব্যবসায়ী ফার্মের ক্যানভাসার হয়ে সে যাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর।

সুরেশ্বরের বাড়ী হুগলী জেলার একটা গ্রামে। বেজায় ম্যালেরিয়ায় দেশটা উচ্ছন্ন গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে
অত্যন্ত বনজঙ্গল, পোড়ো বাড়ীর ইট স্তূপাকার হয়ে পথে যাতায়াত বন্ধ করেছে, সন্ধ্যার পর সুরেশ্বরের পাড়ায়
আলো জ্বলে না।

ওদের পাড়ায় চারিদিকে বনজঙ্গল ও ভাঙা পোড়ো বাড়ীর মধ্যে একমাত্র অধিবাসী সুরেশ্বররা। কোনো
উপায় নেই বলেই এখানে পড়ে থাকা—নইলে কোন্ কালে উঠে গিয়ে শহর-বাজারের দিকে বাস করতো ওরা।

সুরেশ্বর বি. এসসি. পাস করেএতদিন বাড়ীতে বসে ছিল। চাকরি মেলা দুর্ঘট আর কে-ই বা করে দেবে—
এই সব জন্যেই সে চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। তার বাবা সম্প্রতি পেন্সেন্ নিয়ে বাড়ী এসে বসেছেন, খুব সামান্যই
পেন্-সন আয়ে সংসার চালানো কায়ক্লেশে হয়; কিন্তু তাও পাড়াগাঁয়ে। শহরে সে আয়ে চলে না। বছরখানেক
বাড়ী বসে থাকবার পরে সুরেশ্বর গ্রামে আর থাকতে পারলে না। গ্রামে নেই লোকজন। আর সমবয়সী এমন
কোনো ভদ্রলোকের ছেলে নেই যার সঙ্গে দু'দণ্ড কথাবার্তা বলা যায়। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে আলো
নিবিয়ে শুয়ে পড়াই গ্রামের নিয়ম। তারপর কোনোদিকে সাড়াশব্দ নেই।

ক্রমশঃ এ জীবন সুরেশ্বরের অসহ্য হয়ে উঠল। সে ঠিক করলে কলকাতায় এসে টুইশানি করেও যদি
চালায়, তবুও তো শহরে সে থাকতে পারবে এখন।

প্রায় মাস পাঁচ-ছয় আগে সুরেশ্বর কলকাতায় আসে এবং দেশের একজন পরিচিত লোকের মেসে ওঠে।
এতদিন এক আধটা টুইশানি করেই চালাচ্ছিল, সম্প্রতি এই চাকরিটা পেয়েচে, তারই এক ছাত্রের পিতার
সাহায্যে ও সুপারিশে। সঙ্গে তিন বাস্তব ঔষধ-পত্রের নমুনা আছে বলে তাদের ফার্মের মোটরগাড়ী ওকে চাঁদপাল
ঘাটে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

এই প্রথম চাকরি এবং এই প্রথম দূর বিদেশে যাওয়া—সুরেশ্বরের মনে খানিকটা আনন্দ ও খানিকটা
বিষাদ মেশানো এক অদ্ভুত ভাব। একদল মানুষ আছে, যারা অজানা দূর বিদেশে নতুন নতুন বিপদের সামনে
পড়বার সুযোগ পেলে নেচে ওঠে—সুরেশ্বর ঠিক সে দলের নয়। সে নিতান্তই ঘরকুনো ও নিরীহ ধরনের
মানুষ—তার মতো লোক নিরাপদে চাকরি করে আর দশজন বাঙালী ভদ্রলোকের মতো নির্বিঘ্নে সংসার-ধর্ম
পালন করতে পারলে সুখী হয়।

তাকে যে বিদেশে যেতে হচ্ছে—তাও যে সে বিদেশ নয়, সমুদ্রপারের দেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে—সে
নিতান্তই দায়ে পড়ে। নইলে চাকরী থাকে না। সে চায় নি এবং ভেবেও রেখেছে এইবার নিরাপদে ফিরে
আসতে পারলে অন্য চাকরীর চেষ্টা করবে।

কিন্তু জাহাজ ছাড়বার পরে সুরেশ্বরের মন্দ লাগছিল না। ধীরে ধীরে বোটানিক্যাল গার্ডেন, দুইতীর-ব্যাপী
কল-কারখানা পেছনে ফেলে রেখে প্রকাণ্ড জাহাজখানা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভোর ছ'টায় জাহাজ
ছেড়েছিল, এখন বেশ রৌদ্র উঠেছে, ডেকের একদিকে অনেকখানি জায়গায় যাত্রীরা ডেক-চেয়ার পেতে
গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, স্টীমারের একজন কর্মচারী সবাইকেবলে গেল পাইলট নেমে যাওয়ার আগে যদি
ডাঙায় কোনো চিঠি পাঠানো দরকার হয় তা যেন লিখে রাখা হয়।

বয় এসে বন্ধে—আপনাকে চায়ের বদলে আর কিছুর দেবো?

সুরেশ্বর সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী, সে চা খায় না, এ খবর আগেই জানিয়েছিল এবং কিছু আগে সকলকে চা
দেওয়ার সময়ে চায়ের পেয়ালা সে ফেরৎ দিয়েছে।

সুরেশ্বর বন্ধে—না, কিছু দরকার নেই।

বয় চলে গেল।

এমন সময় কে একজন বেশ মার্জিত ভদ্র সুরে পেছনের দিক থেকে জিজ্ঞেস করলে— মাপ করবেন, মশায় কি বাঙালী?

সুরেশ্বর পেছনে ফিরে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে এইমাত্র একজন নব আগন্তুক যাত্রী তার ডেক—চেয়ার পাতবার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে ও তাকে প্রশ্ন করছে। তার বয়স পঁচিশ—ছাব্বিশের বেশী নয়, একহারা দীর্ঘ সুঠাম চেহারা। সুন্দর মুখশ্রী, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—সবসুদ্ধ মিলিয়ে বেশ সুপুরুষ।

সুরেশ্বর উত্তর দেওয়ার আগেই সে লোকটি হাসিমুখে বললে—কিছু মনে করবেন না, একসঙ্গেই ক’দিন থাকতে হবে আপনার সঙ্গে, একটু আলাপ করে নিতে চাই। প্রথমটা বুঝতে পারি নি আপনি বাঙালী কিনা।

সুরেশ্বর হেসে বললে—এর আর মানে করবার আছে কি? ভালই তো হোল আমার পক্ষেও। সেকেন্ড ক্লাসে আর কি বাঙালী নেই?

—না, আর যাঁরা যাচ্ছেন—সবাই ডেকে। একজন কেবল ফার্স্টক্লাসের যাত্রী। আপনি কতদূর যাবেন—রেপুনে?

—আপাততঃ তাই বটে—সেখান থেকে যাবো সিঙ্গাপুর।

—বেশ, বেশ, খুব ভাল হোল। আমিও তাই। সরে এসে বসুন এদিকে, আপনার সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমিয়ে নিই। বাঁচলুম আপনাকে পেয়ে।

সুরেশ্বর শীঘ্রই তার সঙ্গীটির বিষয়ে তার নিজের মুখেই অনেক কথা শুনলে। ওর নাম বিমলচন্দ্র বসু, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে ডাক্তারী করবার চেষ্টায় সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। বিমলের বাড়ী কলকাতায়, ওদের অবস্থা বেশ ভালই। ওদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের বন্ধু সিঙ্গাপুর ব্যবসা করেন, তাঁর নামে বিমল চিঠি নিয়ে যাচ্ছে।

কথাবার্তা শুনে সুরেশ্বরের মনে হোল বিমল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী। নতুন দেশে নতুন জীবনের মধ্যে যাবার আনন্দে সে মশগুল। সে বেশ সবল যুবকও বটে। অবশ্যি সুরেশ্বর নিজেও গায়ে ভালই শক্তি ধরে, এক সময়ে রীতিমত ব্যায়াম ও কুস্তি করতো, তারপর গ্রামে অনেকদিন থাকার সময়ে সে মাটি-কোপানো, কাঠ-কাটা প্রভৃতি সংসারের কাজ নিজের হাতে করতো বলে হাত পা যথেষ্ট শক্ত ও কর্মক্ষম।

ক্রমে বেলা বেশ পড়ে এল। সুরেশ্বর ও বিমল ডেকে বসে নানারকম গল্প করছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমল বললে—আমি একবার কেবিন থেকে আসি, আপনি বসুন। ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়েছে, এখুনি পাইলট নেমে যাবে। আমার চিঠিপত্র দিতে হবে ওর সঙ্গে। আপনি যদি চিঠিপত্র দেন তবে এই বেলা লিখে রাখুন।

সাগর-পয়েন্টের বাতিঘর দূর থেকে দেখা যাওয়ার কিছু আগেই কলকাতা বন্দরের পাইলট জাহাজ থেকে নেমে একখানা স্টীমলঞ্চের কলকাতার দিকে চলে গেল।

সাগর-পয়েন্ট ছাড়িয়ে কিছু পরেই সমুদ্র—কোনো দিকে ডাঙা দেখা যায় না—ঈষৎ ঘোলা ও পাটকিলে রঙের জলরাশি চারি ধারে। সন্ধ্যা হয়েছে, সাগর-পয়েন্টের বাতিঘরে আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলছে, কতকগুলো সাদা গাঙচিল জাহাজের বেতারের মাস্তুলের ওপর উড়ছে। ঠাণ্ডাহাওয়ায় শীত করছে বলে বিমল কেবিন থেকে ওভারকোটটা আনতে গেল, সুরেশ্বর ডেকে বসে রইল।

জ্যেৎশ্না রাত। ডেকের রেলিং-এর ধারে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, সুরেশ্বরের মন এই সন্ধ্যায় খুবই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ বাড়ীর কথা ভেবে, বৃদ্ধ বাপমায়ের কথা ভেবে, আসবার সময়ে বোন প্রভার অশ্রুসজল করুণ মুখখানির কথা ভেবে।

পূর্বেই বলেছি সুরেশ্বর নিরীহ প্রকৃতির ঘরোয়া ধরনের লোক। বিদেশে যাচ্ছে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চাকরীর খাতিরে। বিমল যদিও সুরেশ্বরের মত ঘরকুণো নয়, তবুও তার সিঙ্গাপুরে যাবার মধ্যে কোন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল না। সে চিঠি নিয়ে যাচ্ছে পরিচিত বন্ধুর নিকট থেকে সেখানকার লোকের নামে, তারা ওকে সন্ধান বলে দেবে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে; তারপর বিমল সেখানে একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে গেটের গায়ে নাম-খোদাই পেতলের পাত বসিয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মত ডাক্তারী আরম্ভ করে দেবে—এই ছিল তার মতলব। যেমন পাঁচজনে দেশে বসে করছে, সে না হয় গিয়ে করবে সিঙ্গাপুরে।

কিন্তু দুজনেই জানতো না একটা কথা।

তারা জানতো না যে নিরুপদ্রব, শান্তভাবে ডাক্তারী ও ওষুধের ক্যানভাসারি করতে তারা যাচ্ছে না—তাদের অদৃষ্ট তাদের দুজনকে একসঙ্গে গাঁথে নিয়ে চলেছে এক বিপদসঙ্কুল পথযাত্রায় এবং তাদের দুজনের জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার দিকে।

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে। বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

একদিন দুপুরে বিমল সুরেশ্বরকে উত্তেজিত সুরে ডাক দিয়ে বল্লে—চট করে চলে আসুন, দেখুন, কি একটা জন্তু!

জন্তুটা আর কিছু নয়, উড্ডীয়মান মৎস্য। জাহাজের শব্দে জল থেকে উঠে খানিকটা উড়ে আবার জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম সুরেশ্বর উড্ডীন মৎস্য দেখলে; ছেলেবেলায় চারুপাঠে ছবি দেখেছিল বটে।

মাঝে মাঝে অন্য অন্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রায়ই কলকাতাগামী জাহাজ।

ওরা জাহাজের নাম পড়ছে—ওরা কেন, সবাই। এ অকূল জলরাশির দেশে অন্য একখানা জাহাজ ও অন্য লোকজন দেখতে পাওয়া যেন কত অভিনব দৃশ্য! শত শত যাত্রী ঝুঁকে পড়েছে সাগ্রহে রেলিংয়ের ওপর, নাম পড়ছে, কত কী মন্তব্য করছে। ওরাও নাম পড়লে—একখানার নাম ড্যালহাউসি, একখানার নাম ইরাবতী, একখানার নামের কোন মানে হয় না—কিলাওয়াজা—অন্ততঃ ওরা তো কোনো মানে খুঁজে পেল না। একখানা জাপানী এন. ওয়াইকে লাইনের জাহাজ হিদজুমারু, উদীয়মান সূর্য-আঁকা পতাকা ওড়ানো।

দুদিনের দিন রাতে বেসিন লাইটহাউসের আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর সমুদ্র-পাড়ায় কাতর হয়ে পড়েছে, কিন্তু বিমল ঠিক খাড়া আছে, যদিও তার খাওয়ার ইচ্ছা প্রায় লোপ পেয়েছে। সুরেশ্বর তো কিছুই খেতে পারে না, যা খায় পেটে তলায় না, দিনরাত কেবিনে শুয়ে আছে, মাথা তুলবার ক্ষমতা নেই।

জাহাজের স্টুয়ার্ড এসে দেখে গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

কি বিশ্রী জিনিস এই পরের চাকরী! এত হাঙ্গামা পোয়ানো কি ওর পোষায়?দিব্বি ছিল, বাড়ীতে খাচ্ছিল দাচ্ছিল। চাকরীর খাতির বিদেশে বেরিয়ে কি ঝকঝক দেখা তো।

বিমল আপন মনে ডেকে বসে বই পড়ে, স্ফূর্তিতে শিস্ দেয়, গান করে। সুরেশ্বরকে ঠাট্টা করে বলে—হোয়াট এ গুড সেলার ইউ আর।

তিন দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত জাহাজে চলবার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এলিফ্যান্ট পয়েন্টের লাইটহাউস দেখা গেল।

বেলাভূমিও যদিও দেখা যায় না, তবুও সমুদ্রের জলের ঘোর নীল রং ক্রমশঃ সবুজ হয়ে ওঠাতে বোঝা গেল যে ডাঙা বেশী দূরে নেই। ডাঙার গাছপালা মাঝে মাঝে জলে ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার অল্প পরেই জাহাজ ইরাবতীর মোহনায় প্রবেশ করলে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল, রয়েল মেলের নিশান উড়িয়ে দেওয়া হোল মাস্তুলে। সন্ধ্যাকাশ তখনও যেন লাল। সন্ধ্যা তারার সঙ্গে চাঁদ উঠেছে পশ্চিমাকাশে—ইরাবতীবক্ষে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

জাহাজ কিছুদূর গিয়ে নোঙর ফেললে। রাতে ইরাবতী নদীতে বড় জাহাজ চালানোর নিয়ম নেই। রেঙ্গুনের পাইলট রাতে জাহাজে থাকবে, সকালে ইরাবতীবক্ষে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

ভোরবেলায় কেবিন থেকে ঘুমচোখে বেরিয়ে এসে সুরেশ্বর দেখলে জাহাজ চলছে ইরাবতীর দুই তীরের সমতলভূমি ও ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। যতদূর চোখ যায় নিম্ন বঙ্গের মতো শস্যশ্যামলা ঘন সবুজ ভূমি, কাঠের ঘর বাড়ী। তারপরেই রেঙ্গুনে পৌঁছে গেল জাহাজ।

সুরেশ্বর বা বিমল কেউই রেঙ্গুনে নামবে না। সুরেশ্বরের রেঙ্গুনে কাজ আছে বটে কিন্তু সে ফিরবার মুখে। ওরা দুজনেই এ জাহাজ থেকে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে ওদের জিনিসপত্র রেখে শহর বেড়াতে বেরুল।

বেশী কিছু দেখবার সময় নেই। দুপুরের পরেই সিঙ্গাপুরের জাহাজ ছাড়বে, জাহাজের ‘পার্সার’ বলে দিলে বেলা সাড়ে বারোটোর আগেই ফিরে আসতে।

নতুন দেশ, নতুন মানুষের ভিড়। ওরা যা কিছু দেখছে, বেশ লাগছে ওদের চোখে। লেক, পার্ক ও সোয়েডাগোং প্যাগোডা দেখে ওরা জাহাজে ফিরবার কিছু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিলে।

আবার অকূল সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি।

একদিন সুরেশ্বর বিমলকে বললে—দেখ বিমল, কাল রাতে বড় একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি—এ কয়দিনের মেলামেশায় তাদের পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা ‘তুমি’তে পৌঁচেছে।

—কি স্বপ্ন?

—তুমি আর আমি ছোট একটা অদ্ভুত গড়নের বাজরা নৌকা করে সমুদ্রে কোথায় যাচ্ছি। সে ধরনের বাজরা আমি ছবিতে দেখেছি, ঠিক বোঝাতে পারছি নে এখন। তারপর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, খালি ধোঁয়া—বিশ্রী কালো ধোঁয়া—

—আমরা বাঁচলাম তো! না খসলাম?

কথা শেষ করে বিমল হো হো করে হেসে উঠলো। সুরেশ্বর চুপ করে রইল।

বিমল বললে—আমি একটা প্রস্তাব করি শোনো। চলো দুজনে সিঙ্গাপুর গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ডাক্তারখানা খুলি। তুমি তোমার কোম্পানীকে বলে ওষুধ আনাবে। বেশ ভাল হবে। আমি ডাক্তারী করবো।

রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ছেড়ে দুইদিন দুই রাত অনবরত যাওয়ার পরে চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল। রেঙ্গুনের মতো সমতলভূমি নয়, উঁচু নীচু, যেদিকে চাও সেদিকে পাহাড়। উপকূলের চতুর্দিকেই মাছ ধরবার বিপুল আয়োজন, বড় বড় কালো রঙের খুঁটি দিয়ে ঘেরা, জাল ফেলা। জেলেদের থাকবার টিনের ঘর। পালতোলা জেলে-ডিঙিতে অহরহ তীর আচ্ছন্ন।

পিনাং বন্দরে জাহাজ ঢুকবামাত্রই অসংখ্য সাম্পান এসে জাহাজের চারিধারে ঘিরলে। মাঝিরা সকলেই চীনেম্যান।

ওরা সাম্পানে করে বন্দরে নেমে শহর দেখতে বার হোল। ঘণ্টা হিসাবে দুজনে একখানা রিকশা করলে—ঘণ্টা-পিছু কুড়ি সেন্ট ভাড়া।

পিনাঙে ঠিক সমুদ্রতীরে একটু সমতলভূমি, চারিদিকেই পাহাড়, অনেকগুলো ছোট নদী এই সব পাহাড় থেকে বার হয়ে শহরের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে।

ওরা একটা পাহাড়ের ওপর চীনা মঠ দেখতে গেল। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, বাগান পুরোহিতের ঘর, দেবমন্দির স্তরে স্তরে উঠেছে। বাগানের চারিদিকে নালায় ঝরণার স্রোতে কত পদ্ম গাছ। মন্দিরের মধ্যে টেওস্ট ধর্মজ দেবমূর্তি।

এদের মধ্যে একটি মূর্তি দেখে সুরেশ্বর চমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কোন চীনা দেবতার মূর্তি, জ্রুকুটি-কুটিল, কঠিন, রক্ষ মুখ। হাতে অস্ত্র, দাঁড়বার ভঙ্গিটি পর্যন্ত আক্ৰোশপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস করতে উদ্যত।

বিমল বললে—কি, দাঁড়ালে যে?

—দেখছো মূর্তিটা? মুখচোখের কি ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাব দেখেছো?

মন্দিরের পুরোহিতদের জিগ্যেস করে জানা গেল ওটি টেওস্ট রণদেবতার মূর্তি।

হঠাৎ সুরেশ্বর বললে—চল, এখান থেকে চলে যাই।

বিস্মিত বিমল বললে—ওকি, পাহাড়ের উপরে যাবে না?

সুরেশ্বর আর উঠতে অনিচ্ছুক দেখে বিমল ওকে নিয়ে জাহাজে ফিরলো।

পথে বললে—তোমার কি হোল হে সুরেশ্বর? ও রকম মুখ গম্ভীর করে মনমরা হয়ে পড়লে কেন?

সুরেশ্বর বললে—কই না, ও কিছু নয়, চলো।

জাহাজে ফিরে এসেও কিন্তু সুরেশ্বরের সে ভাব দূর হোল না। ভাল করে কথা কয় না, কি যেন ভাবছে। নৈশভোজের টেবিলে ও ভাল করে খেতেও পারলে না।

রাত ন'টার পরে পিনাং থেকে জাহাজ ছাড়লে সুরেশ্বর যেন কিছু স্বস্তি অনুভব করলে। পিনাং বন্দরের জেটির আলোকমালা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওরা ডেকে এসে বসেছে নৈশভোজেরপরে।

হঠাৎ সুরেশ্বর বলে উঠলো—উঃ, কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম ওই চীনা দেবতার মূর্তিটা দেখে!

বিমল হেসে বললে—আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু সত্যি তুমি এত ভীতু তা তো জানি নে! স্বীকার করি মূর্তিটা অবিশ্যি কমনীয় নয়, তবুও—

সুরেশ্বর গম্ভীর মুখে বললে—আমার মনে হচ্ছে কি জানো বিমল? আমরা যেন এই দেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছি। সব সময় সব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা ঐ চীনে মন্দিরে গিয়ে ভাল কাজ করিনি।

পিনাং থেকে ছাড়বার তিন দিন পরে জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌঁছুলো।

দূর থেকে সিঙ্গাপুরের দৃশ্য দেখে বিমল ও সুরেশ্বর খুব খুশী হয়ে উঠলো। শুধু মালয় উপদ্বীপ কেন, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটি প্রধান বন্দর, বন্দরে ঢুকবার সময়েই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তাদের ওপর সুদৃশ্য ঘরবাড়ী—চারিদিকে পিনাং—এর মত মাছ ধরবার প্রকাণ্ড আড্ডা নীল রংএ চিত্রিত চক্ষু ড্রাগন, বোলানো পাল-তোলা সেই চীনা জাহাজ ও সাম্পানে সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বন্দরে ঢুকবার মুখেই একখানা বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ প্রায় মাঝ-দরিয়ায় নোঙর করে আছে কয়লা নেবার জন্যে। তার প্রকাণ্ড ফোকরওয়ালা দুই কামান ওদের দিকে মুখ হাঁ করে আছে যেন ওদের গিলবার লোভে। আরও নানা ধরনের জাহাজ, স্টীমলঞ্চ, সাম্পান, মালয় নৌকার ভিড়ে বন্দরের জল দেখা যায় না। যে দিকে চোখ পড়ে শুধু নৌকো আর জাহাজ, বিমলের মনে হলো কলকাতা এর কাছে কোথায় লাগে? তার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বড় বন্দর।

চারিধারেই বারসমুদ্র, বন্দরের মুখে ছোট-বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে আরো দু'খানা বড় যুদ্ধ-জাহাজ ওদের চোখে পড়লো। বন্দরের উত্তর-পূর্ব কোণে তিন মাইলের পরে বিখ্যাত নৌ-বহরের আড্ডা। দূর থেকে দেখা যায়, বড় বড় ইস্পাতের খুঁটি, বেতারের মাস্তুলে সেদিকটা অরণ্যের সৃষ্টি করেছে।

জাহাজের কয়লা নেবার একটা প্রধান আড্ডা সিঙ্গাপুর। পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে পূর্বগামী সব রকম জাহাজকেই এখানে দাঁড়াতে হবে কয়লার জন্যে। এর বিপুল ব্যবস্থা আছে, বহুদূর ধরে পর্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হয়েছে, যেন সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন কয়লার পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে।

বন্দরে জাহাজ এসে থামলে সুরেশ্বর ও বিমল চীনে কুলি দিয়ে মালপত্র এনে দুখানা রিক্শা ভাড়া করলে। ওরা দুজনেই একটা ভারতীয় হোটেল দেখে নিয়ে সেখানে উঠলো। বিকালের দিকে সুরেশ্বর তার ওষুধের ফার্মের কাজে কয়েক জায়গায় ঘুরে এল, বিমল যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে সুরেশ্বর জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে? অমনভাবে বসে কেন?

বিমল বললে—ভাই, এতদূরে পয়সা খরচ করে আসাই মিথ্যে হোল। আমি যা ভেবে এখানে এলুম তা হবার কোনো আশা নেই। যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিলাম, তাঁর নিজের ভাগ্নে ডাক্তার হয়ে এসে বসেছে। আমার কোনো আশাই নেই।

সুরেশ্বর বললে—তাতে কি হয়েছে? এতবড় সিঙ্গাপুর শহরে দু'জন বাঙালী ডাক্তারের স্থান হবে না? ক্ষেপেছ তুমি? আমি ওষুধের দোকান খুলছি, তুমি সেখান ডাক্তার হয়ে বোসো। দেখো কি হয় না হয়।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে হলো তাদের ঘরের বাইরে জানলার কাছে কে যেন একজন ওদের কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

বিমল বললে—ও কে?

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তার মনে হোলো একজন যেন বারান্দার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে ফিরে এসে বল্লে—ও কিছু না, কে একজন গেল।

তারপর ওরা দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একখানা ওষুধের দোকান খুলবার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করলে। বিমল হাজারখানেক টাকা এখন ঢালতে প্রস্তুত আছে, সুরেশ্বর নিজেদের ফার্মকে বলে ওষুধের যোগাড় করবে।

বড় ডাকঘরের ক্লক টাওয়ারে ঢংঢং করে রাত এগারোটা বাজলো। হোটেলের চাকর এসে দু'জনের খাবার দিয়ে গেল। শিখের হোটেল, মোটা মোটা সুস্বাদু রুটি ও মাংস, আস্ত মাসকলায়ের ডাল ও আলুর তরকারী— এই আহাৰ্য্য। সারাদিনের ক্লান্তির পরে তা অমৃতের মতো লাগলো ওদের।

আহাৰাদি সেরে সুরেশ্বর শোবার যোগাড় করতে যাচ্ছে এমন সময় বিমল হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

সুরেশ্বর বল্লে—কি?

বিমল ফিরে এসে বিছানায় বসলো। বল্লে—আমার ঠিক মনে হোলো কে একজন জানলাটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। কাউকে দেখলুম না। কিন্তু—

সুরেশ্বরের কি রকম সন্দেহ হোলো। বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, নানা রকম বিপদের আশঙ্কা এখানে পদে পদে। সে বল্লে, সাবধান থাকাই ভালো। দরজা বেশ বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ো। রাতও হয়েছে অনেক।

সুরেশ্বরের ঘুম ছিল সজাগ। তাই অনেক রাতে একটা কিসের শব্দে ও ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসলো সন্দিগ্ধ মন নিয়ে।

বিছানার শিয়রের দিকে জানলাটা খোলা ছিল। বিছানা ও জানলার মধ্যে একটা ছোট টেবিলের দিকে নজর পড়াতে সুরেশ্বর দেখলে টেবিলের ওপর ঢিল জড়ানো একটুকরো কাগজ। এটাই বোধ হয় একটু আগে জানলা দিয়ে এসে পড়েছে, তার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘরে আলো জ্বলাই ছিল। কাগজের টুকরোটা ও পড়লে, তাতে ইংরাজিতে লেখা রয়েছে—

আপনারা ভারতীয়। যতদূর জানতে পেরেছি সিঙ্গাপুরে আপনারা নবাগত ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। কাল দুপুর বেলা বোটানিক্যাল গার্ডেনে অর্কিডের ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে বড় ডুরিয়ান ফলের গাছ আছে, তার নীচে অপেক্ষা করবেন দুজনেই। আপনাদের দুজনের পক্ষেই লাভজনক কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। আসতে ইতস্ততঃ করবেন না।

লেখার নীচে নাম-সই নেই।

বিমলও কাগজখানা পড়লে।

ব্যাপার কি? এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

সুরেশ্বর প্রথমে কথা বল্লে। বল্লে—কেউ তামাশা করেছে বলে মনে হচ্ছে, কি বলো? কিন্তু তাই বা করবে কে, আমাদের চেনেই বা কে?

বিমল চিন্তিত মুখে বল্লে—কিছু বুঝতে পারছি নে। কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি?

—কি খারাপ উদ্দেশ্য? আমরা যে খুব বড়লোক নই, তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়া হোটেল বা এম্পায়ার হোটলে না উঠে এখানে উঠেছি। টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়েও যাচ্ছিনে। সুতরাং কি করতে পারে আমাদের?

সে রাত্রে মতো দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে বিমল বল্লে—চল যাওয়াই যাক। এতে ভয় কিসের? বোটানিক্যাল গার্ডেন তো আর নির্জন মরুভূমি নয়, সেখানে কত লোক বেড়ায় নিশ্চয়ই। দু'জনকে খুন করে দিনের আলোয় টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এত ভরসা কারু হবে না।

দুপুরের পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে কুয়ালা জোহোর স্ট্রীটের মোড় থেকে একখানা রিক্সা ভাড়া করলে। ম্যাসিডন্ কোম্পানীর সোডাওয়াটারের দোকানের সামনে একজন চীনা ভদ্রলোক ওদের রিক্সা থামিয়ে চীনে

রিকশাওয়ালাকে কি জিগ্যেস করলে। তারপর উত্তর পেয়ে লোকটি চলে গেল। বিমল রিকশাওয়ালাকে ইংরিজীতে জিগ্যেস করলে—কি বন্ধে তোমাকে হে?

রিকশাওয়ালা বন্ধে—জিগ্যেস করলে সওয়ারী কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—তুমি কি বন্ধে?

—আমি কিছু বলিনি। বলবার নিয়ম নেই আমাদের। সিঙ্গাপুর খারাপ জায়গা, মিস্টার।

বোটানিক্যাল গার্ডেন শহর ছাড়িয়ে প্রায় দু'মাইল দূরে। শহর ছাড়িয়েই প্রকাণ্ড একটা কিসের কারখানা। তারপর পথের দু'ধারে ধনী মালয়, ইউরোপীয় ও চীনাদের বাগানবাড়ী। এমন ঘন সবুজ গাছপালার সমাবেশ ও শোভা, বিমল ও সুরেশ্বর বাংলাদেশের ছেলে হয়েও দেখেনি—কারণ বিষুবরেখার নিকটবর্তী এই সব স্থানের মতো উদ্ভিদ সংস্থান ও প্রাচুর্য্য পৃথিবীর অন্য কোথাও হওয়া সম্ভব নয়।

মাঝে মাঝে রবারের বাগান।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছে ওরা রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করলে। প্রকাণ্ড বড় বাগান। কত ধরনের গাছপালা, বেশীর ভাগই মালয় উপদ্বীপজাত। বড় বড় রুটিফলেরগাছ, ডুরিয়ান্ পাকবার সময় বলে ডুরিয়ান্ ফলের গাছের নীচে দিয়ে যেতে পাকা ডুরিয়ান্ ফলের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নারিকেলকুঞ্জ একটি অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় স্থান। এত উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের এমন ঘন সন্নিবেশ ওরা কোথাও দেখে নি। নিস্তন্ধ দুপুরে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় কি পাখী ডাকছে সুস্বরে, আকাশ সুনীল, জায়গাটা বড় ভাল লাগলো ওদের। অর্কিড হাউস খুঁজে বার করে তার উত্তর পূর্ব কোণে সত্যই খুব বড় একটা ডুরিয়ান্ ফলের গাছ দেখা গেল। সে গাছেরও ফল পেকে যথারীতি দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

বিমল বললে—একটু সতর্ক থাকো। দেখা যাক না কি হয়।

সবুজ টিয়ার ঝাঁক গাছের ডালে ডালে উড়ে বসছে। একটা অপূর্ব শান্তি চারিদিকে— ওরা দুজনে ডুরিয়ান্ গাছের ছায়ায় শুকনো তালপাতা পেতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

মিনিট তিনও হয়নি, এমন সময় কিছুদূরে এক মাদ্রাজী ও একজন চীনা ভদ্রলোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর ও বিমল দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো।

ওরা কাছে এসে অভিবাদন করলে। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুবেশ, তিনি বেশ পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন—আপনারা ঠিক এসেছেন তাহলে। ইনি মিঃ আ-চিন্ স্থানীয় কনসুলেট আপিসের মিলিটারি অ্যাটাসে। আমার নাম সুব্বা রাও।

পরস্পরের অভিবাদন-বিনিময় শেষ হবার পর চারজনই সেই ডুরিয়ান্ গাছের তলায় বসলো। সমগ্র বোটানিকেল গার্ডেনে এর চেয়ে নির্জন স্থান আছে কিনা সন্দেহ।

সুব্বা রাও বললেন—প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করি—আপনারা দুজনেই উপাধিধারী ডাক্তার তো? সুরেশ্বর বললে, সে ডাক্তার নয়, ঔষধ-ব্যবসায়ী। বিমল পাস-করা ডাক্তার।

এ কথার উত্তরে আ-চিন বললে—দুজনকেই আমাদের দরকার। একটা কথা প্রথমেই বলি, আমাদের দেশ ঘোর বিপন্ন। আমরা ভারতের সাহায্য চাই। জাপান অন্যায়াভাবে আমাদের আক্রমণ করছে, দেশে খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। আমরা গোপনে ডাক্তারী ইউনিট গঠন করে দেশে পাঠাচ্ছি। কারণ আইনতঃ বিদেশ থেকে আমরা তা সংগ্রহ করতে পারি না। আপনারা বুদ্ধের দেশের লোক, আমরা আপনাদের মন্ত্রশিষ্য। আমাদের সাহায্য করুন। এর বদলে আমাদের দরিদ্র দেশ দুশো ডলার মাসিক বেতন ও অন্যান্য খরচ দেবে। এখন আপনারা বিবেচনা করে বলুন আপনাদের কি মত?

সুরেশ্বর বললে—যদি রাজী হই, কবে যেতে হবে।

—এক সপ্তাহের মধ্যে। লুকিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন হংকং যাবার পাসপোর্ট আপনারা পাবেন না। আমার গভর্নমেন্ট সে ব্যবস্থা করবেন ও আপনাদের এখানে এই এক সপ্তাহ থাকার খরচ বহন করবেন। আপনারা যদি রাজী হন, আমার গভর্নমেন্ট আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সুঝা রাও বললেন—জবাব এখন দিতে হবে না। ভেবে দেখুন আপনারা। আজ সন্ধ্যাবেলা জোহোর স্ট্রীটের বড় পার্কের ব্যান্ড স্ট্যাণ্ডের কাছে আমি ও আ-চিন থাকবো। কিন্তু দয়া করে কাউকে জানাবেন না।

ওরা চলে গেলে বিমল বলল—কি বল সুরেশ্বর, শুনলে তো সব ব্যাপার?

সুরেশ্বর বলল—চল যাই। এখন আমাদের বয়স কম, দেশবিদেশে যাবার তো এই সময়। একটা বড় যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল ইউনিটে থাকলে ডাক্তার হিসাবে তোমারও অনেক জ্ঞান হবে। চীনদেশটাও দেখা হয়ে যাবে পরের পয়সায়।

বিমল বলল—আমার তো খুবই ইচ্ছে, শুধু তুমি কি বল তাই ভাবছিলুম।

সন্ধ্যাবেলায় ওরা এসে জোহোর স্ট্রীটের পার্কের ব্যান্ড স্ট্যাণ্ডের কোণের আ-চিন্ ও সুঝা রাওয়ের সান্ধ্যপেলে। ওদের সব কথাবার্তা শুনে আ-চিন বলল—তা হলে আপনাদের রওনা হতে হবে কাল রাত্রে। ক’দিনে আপনাদের হোটেলের বিল যা হয়েছে তা কাল বিকালেই চুকিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করবেন। বাকী ব্যবস্থা আমি করবো আর এই নিন্—

কথা শেষ করে বিমলের হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে আ-চিন ও সুঝা রাও চলে গেলেন।

বিমল খুলে দেখলে কাগজখানা একশো ডলারের নোট।

পরদিন সকাল থেকে ওরা বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা, কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রইল। বৈকালে নির্দেশমত আবার ব্যান্ড স্ট্যাণ্ডের কোণে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরেই আ-চিন এলেন। বিমলকে জিগ্যেস কল্লেন—আপনাদের জিনিসপত্র?

—হোটলেই আছে।

—হোটলে রেখে ভাল করেন নি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হোটলে গিয়ে জিনিসপত্র তুলে এখানে নিয়ে আসুন। আমি এখানেই থাকি। পার্কের কোণে ছোট রাস্তার ওপর গাড়ী দাঁড় করিয়ে হর্ন দিতে বলবেন। আপনাদের আর কিছু লাগবে?

—না, ধন্যবাদ। যা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট।

আধঘণ্টার মধ্যেই বিমল ও সুরেশ্বর ট্যাক্সিতে ফিরে পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতে লাগলো।

আ-চিন্ এসে ওদের গাড়ীতে উঠে মালয় ভাষায় ড্রাইভারকে কি বললেন। সে ট্যাক্সি বড় পোস্ট অফিসের সামনে এনে দাঁড় করালো।

বিমল বলল—এখানে কি হবে?

বিমলের কথা শেষ হতে না হতে ওদের ট্যাক্সির পাশে একখানা নীল রংয়ের হুইপেট গাড়ী এসে দাঁড়ালো। স্টিয়ারিং ধরে আছে একজন চীনা ড্রাইভার।

আ-চিন্ বললেন—উঠুন পাশের গাড়ীতে।

পরে তাঁর ইঙ্গিত মত দু’জন ড্রাইভারে মিলে জিনিসপত্র সব নতুন গাড়ীখানায় তুলে দিলে। গাড়ী যখন তীরবেগে সিঙ্গাপুরের অজানা বড় রাস্তা বেয়ে চলেছে, তখন বিমল বলল—অত সদরে দাঁড়িয়ে ও ব্যবস্থা করলেন কেন? কেউ যদি টের পেয়ে থাকে?

আ-চিন্ বললেন—কেউ করবে না জানি বলেই ঐ ব্যবস্থা। এ সময়ে চীনা ডাক নিতে রোজ কনসুলেট আপিসের লোক ওখানে আসবে সকলেই জানে। আমার পরনে কনসুলেট ইউনিফর্ম, আমি লুকিয়ে কোনো কাজ করতে গেলেই সন্দেহের চোখে লোকে দেখবে। সদরে কেউ কিছু হঠাৎ মনে করবে না।

একটু পরেই সমুদ্র চোখে পড়লো—নারিকেল শ্রেণীর আড়ালে। শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা নিভৃত স্থানে এসে গাড়ী একটা বাংলোর কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকলো। পাশেই নীল সমুদ্র।

আ-চিন্ বল্লেন—এখানে নামতে হবে।

বাংলোর একটা ঘরে ওদের বসিয়ে আ-চিন্ বল্লেন—আমি যাই। এখানে নিশ্চিত মনে থাকুন। কোনো ভয় নেই। যথাসময়ে আপনাদের খাবার দেওয়া হবে। বাকী ব্যবস্থা সব রাত্রে।

তিনি চলে গেলেন। একটু পরে জনৈক চীনা ভৃত্য ছোট ছোট পেয়ালায় সবুজ চা ও কুমড়োর বিচির কেক নিয়ে ওদের সামনে রাখলে।

বিমল বল্লেন—এ আবার কি চিজ বাবা? ইঁদুর ভাজা-টাজা নয় তো?

সুরেশ্বর বল্লেন—ইঁদুর নয়, কুমড়োর বিচি, তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইঁদুর খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, নইলে হরিমটর খেয়ে থাকতে হবে চীন দেশে।

কিন্তু কেকগুলো ওদের মন্দ লাগলো না। চা-পানের পরে ওরা বাংলোর চারিধারে একটুঘুরে বেড়ালে। সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে নির্জন স্থানে সমুদ্রতীরে বাংলাটি অবস্থিত। সমুদ্রের দিকে একসারি ঝাউ অপরাহ্নের বাতাসে সোঁ সোঁ করছিল। দূরে সমুদ্রবক্ষে অন্তসূর্যের আভা পড়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

সুরেশ্বর ভাবছিল হুগলী জেলায় তাদের সেই গ্রাম, তাদের পুরানো বাড়ী—বাপ-মায়ের কথা। জীর্ণ, সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটের পৈঠা বেয়ে মা পুকুরে গা ধুতে নামছেন এতক্ষণ।

জীবনে কি সব অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে! তিন মাস মাত্র আগে সেও এমনি সন্ধ্যায় ঐ গ্রামের খালের ধারটিতে একা পায়চারী করে বেড়াতো ও কি ভাবে কোথায় গেলে চাকরী পাওয়া যায় সেই ভাবনাতে ব্যস্ত থাকতো। আর আজ কোথায় কতদূরে এসে পড়েছে।

বিমল মুগ্ধ হয়েছিল এই সুদূর—প্রসারী শ্যামল সমুদ্র-বেলার সান্ধ্যশোভার দৃশ্যে। সে ভাবছিল কবি ও ঔপন্যাসিকদের পক্ষে এমন বাংলা তো স্বর্গ-মাথার ওপরকার নীল আকাশ—এই সবুজ ঝাউয়ের সারি—ঐ সমুদ্রবক্ষের ছোট ছোট পাহাড়—সত্যিই স্বর্গ—

গভীর রাত্রে আ-চিন্ এসে ওদের ওঠালেন। একখানা মোটরে আধ মাইল আন্দাজ গিয়ে সমুদ্রতীরের একটা নির্জন স্থানে ওরা জিনিসপত্র সমেত ছোট একটা জালি বোটে উঠলো। দূরে বন্দরের আলোর সারি দেখা যাচ্ছে—অন্ধকার রাত্রি, নির্জন সমুদ্রবক্ষে। কিছুদূরে একটা চীনা জাহাজ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল—জালিবোট গিয়ে জাহাজের গায়ে লাগলো।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওরা জাহাজে উঠলো।

পাটাতনের নীচে একটা ছোট কামরা ওদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কামরাতে একটা চীনা মাদুর বিছানো, বেতের বালিশ, চীনা লণ্ঠন, রঙীন গালার পুতুল, কাঁচকড়ার ফুলের টবে নার্সিসাস ফুলগাছ—এমন কি ছোট খাঁচাসমেত একটি ক্যানারি পাখী।

আ-চিন্ বল্লেন—কামরা আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো?

সুরেশ্বর বল্লেন—সুন্দর সাজানো কামরা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আ-চিন্ গম্ভীর ভাবে বল্লেন—ধন্যবাদ আপনাদের। আমাদের বিপন্ন দেশকে দয়া করে আপনারা সাহায্য করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে অজানা ভবিষ্যতের দিকে চলেছেন। ভগবান বুদ্ধের দেশের লোক আপনারা—সব সময়েই আপনারা আমাদের নমস্য। ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক।

সুরেশ্বর বল্লেন—আপনি তো সঙ্গে যাবেন না—এ নৌকো ঠিক জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে তো?

—সে বিষয় ভাববেন না। এ চীন গবর্নমেন্টের বেতনভোগী জাহাজ। তিন দিন পরে একখানা চীনা জাহাজ আপনাদের তুলে নেবে। কারণ সামনে দুস্তর চীন সমুদ্র জাহাজে সে সমুদ্র পার হওয়া তো যাবে না।

আ-চিন্ বিদায় নেবার পরে নৌকা নোঙর ওঠালে। জাহাজের সুসজ্জিত কামরায় মোমবাতির আলো জ্বলছে। অনুকূল বায়ুভরে চীন সমুদ্র বেয়ে নৌকো চলেছে—ঘন অন্ধকার কেবল আলোকোৎক্ষেপক চেউগুলি যেন জোনাকীর ঝাঁকের মতো জ্বলছে।

বিমল বল্লেন—এখান থেকে হংকং সতেরোশো আঠারোশো মাইল দূর। এক ভীষণ চীনসমুদ্র—আর এই জাহাজ তো এখানে মোচার খোলা। প্রাণ নিয়ে এখন ডাঙায় পা দিতে পারলেতো হয়।

সুরেশ্বর বল্লে—এসে ভাল করনি, বিমল। ঝাঁকের মাথায় তখন দুজনেই আ-চিনের কথায় ভুলে গেলুম কেমন—দেখলে? এই জাঙ্কে যদি তোমায় আমায় খুন করে এরা জলে ভাসিয়ে দেয়, এদের কে কি করবে? কেউ জানে না আমরা কোথায় আছি? কেউ একটা খোঁজ পর্যন্ত করবে না।

বিমল বল্লে—ও সব কথা ভেবে কেন মন খারাপ কর? বাইরে যেয়ে সমুদ্রের দৃশ্যটাই একবার দেখ। ফসফোরেসেন্ট টেউগুলো কি চমৎকার দেখাচ্ছে, মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে। ওগুলো কি? ওরা কাউকে কিছু বলতে পারে না, ইংরাজি ভাষা কে জানে নৌকায় তা ওদের জানা নেই। রাত্রে ওদের ঘুম হোল না। ক্রমে পূর্বদিক ফর্সা হয়ে এল, রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরে সূর্য উঠল।

সকাল থেকে নৌকা ভয়ানক নাচুনি ও দুলুনি শুরু করে দিল। চীন সমুদ্র অত্যন্ত বিপজ্জনক, সর্বদা চঞ্চল, ঝড় তুফান লেগেই আছে। ওরা সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়ে কামরার মধ্যে ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। আহারবিহারে রুচি রইল না।

সেদিন বিকেলে এক মস্ত টেউয়ের মাথায় একটি কাটল্ ফিশ এসে পড়ল জাঙ্কের পাটাতনে। সেটা তখনও জ্যান্ত, পালাবার আগেই চীনা মাঝিরা ধরে ফেললে।

জাঙ্কে যা খাবার দেয়, সে ওদের মুখে ভাল লাগে না। ভাত ও সুঁট্‌কিমাছের তরকারী। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত দুটি বাঙালী যাত্রীর পক্ষে চীনা ভাত তরকারী খাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সুরেশ্বর বল্লে—ঝকমারি করেছি এসে ভাই। না খেয়ে তো দেখছি আপাততঃ মরতে হবে।

তৃতীয় দিন দুপুরে দূরে দিগ্বলয়ে একখানা বড় স্টীমারের ধোঁয়া দেখা গেল। ওরা দেখলে জাঙ্কের সারেঙ দূরবীন দিয়ে সেদিকে চেয়ে উদ্ভিগ্ন মুখে কি আদেশ দিলে, মাঝি-মাঝিরা পাল নামিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আবার উল্টোদিকে যাবে নাকি? ব্যাপার কি?

সুরেশ্বর সারেঙকে জিজ্ঞেস করলে—নৌকা ঘোরাচ্ছে কেন?

সারেঙ দূরের অস্পষ্ট জাহাজটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উদ্ভিগ্ন মুখে বল্লে—ইংলিশ ক্রুজার, মিস্টার, ভেরি বিগ্ ক্রুজার—বিগ্ গান—

সুরেশ্বর বল্লে—তাতে তোমাদের ভয় কি? ওরা তোমাদের কিছু বলতে যাবে কেন?

কিন্তু সুরেশ্বর জানতো না সারেঙ-এর আসল ভয়ের কারণ কোনখানে। চীনা সমুদ্রে চীনা বোস্বেটের উপদ্রব নিবারণের জন্যে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ সর্বপ্রকার চীনা নৌকা, জাহাজ ও জাঙ্কের ওপর—বিশেষ করে বন্দর থেকে দূরে বারসমুদ্র দিয়ে যে সব যায়—তাদের ওপর খরদৃষ্টি রাখে। ওদের জাঙ্কে দেখে সন্দেহ হলেই থামিয়ে খানাতল্লাশ করবেই। তা হলে এ জাঙ্কে যে বেআইনি আফিম রয়েছে পাটাতনের নীচে লুকোনো—তা ধরা পড়ে যাবে।

চীনা মাঝিগুলো অতিশয় ধূর্ত। যুদ্ধজাহাজ দূর থেকে যেমনি দেখা, অমনি জাঙ্ক মাঝ সমুদ্রে বুপ করে নোঙর নামিয়ে দিলে ও পাটাতনের নীচে থেকে মাছ ধরার জাল বার করে সমুদ্রে ফেলতে লাগলো—দেখতে দেখতে জাঙ্কখানা একখানি চীনা জেলে-ডিঙিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

বিমল বল্লে—উঃ, কি চালাক দেখেছ!

সুরেশ্বর বল্লে—চালাক তাই রক্ষে—নইলে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এসে যদি আমাদের ধরতো—বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণ করার অপরাধে তোমায় আমায় জেল খাটতে হবে, সে হুঁশ আছে।

ধূসরবর্ণের বিরাটকায় ব্রিটিশ ক্রুজারখানা ক্রমেই নিকটে এসে পড়ছে। এখন তার বড় ফোকরওয়ালা কামানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে একটা ধূসরবর্ণের পর্বত যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

যদি কোনো সন্দেহ করে একটি বড় কামান তাদের দিকে দাগে—আর ওদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে?

চীনা মাঝিমাঝিগুলো মহা উৎসাহে ততক্ষণ জাল ফেলে মাছ ধরছে। সুরেশ্বর ও বিমলের বুক টিপ্‌টিপ্‌ করছে উদ্বেগে ও উত্তেজনায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যুদ্ধজাহাজখানা ওদের দিকে লক্ষ্যই করলে না। ওদের প্রায় একমাইল দূরে দিয়ে সোজা পূর্ণবেগে সিঙ্গাপুরের দিকে চলে গেল।

জাঙ্কসুদ্ধ লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

দুপুরের পরে দূরে একটা ছোট দ্বীপ দেখা গেল।

জাহাজ গিয়ে ক্রমে দ্বীপের পাশে নোঙর করলে। বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে নৌকার জল ফুরিয়ে গেছে—এবং এখানে মিষ্টি জল পাওয়া যায়।

ওরা সেখানে থাকতে থাকতে আর একখানা বড় জাহাজ বিপরীত দিক থেকে এসে ওদের কাছেই নোঙর করলে।

বিমলদের জাহাজের মাঝিরা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়লো নবাগত নৌকাখানা দেখে। সকলেই ঘনঘন চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে চায়—যদিও ভয়ের কারণ যে কি তা সুরেশ্বর বা বিমল কেউ বুঝতে পারলে না।

কিন্তু একটু পরে সেটা খুব ভাল করেই বোঝা গেল।

ও নৌকা থেকে দশ-বারোজন গুপ্তা ও বর্বরর আকৃতির চীনেম্যান এসে ওদের জাহাজ ঘিরে ফেললে। সকলের হাতেই বন্দুক, কারো হাতে ছোরা।

ওদের জাহাজের কেউ কোনো রকম বাধা দিলে না—দেওয়া সম্ভবও ছিল না। দস্যুরা দলে ভারী, তাছাড়া অত বন্দুক এ নৌকায় ছিল না। সকলের মুখ বেঁধে ওরা নৌকায় যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়ে নিজেদের জাহাজে ওঠালে। বিমল ও সুরেশ্বরের কাছে যা ছিল, সব গেল। আ-চিন্ প্রদত্ত একশো ডলারের নোটখানা পর্যন্ত—কারণ সেখানা ভাঙাবার দরকার না হওয়ায় ওদের বাস্তবই ছিল।

চীন সমুদ্রের বোম্বের উপদ্রব সম্বন্ধে বিমল ও সুরেশ্বর অনেক কথা শুনেছিল। সিঙ্গাপুরে আরও শুনেছিল যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় সমস্ত হংকং-এর নিকটবর্তী সমুদ্রে জড়ো হচ্ছে—এদিকে সুতরাং বোম্বের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

চীনা ও মালয় জলদস্যুরা শুধু লুণ্ঠপাট করেই ছেড়ে দেয় না।—যাত্রীদের প্রাণনষ্টও করে। কারণ এরা বেঁচে ফিরে গিয়ে অত্যাচারের সংবাদ সিঙ্গাপুর বা হংকংএ প্রচার করলেই চীন ও ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কড়াকড়ি পাহারা বসাবে সমুদ্রে। ‘মরা মানুষ কোনো কথা বলে না’—এ প্রাচীন নীতি অনেক ক্ষেত্রেই বড় কাজ দেয়।

দেখা গেল বর্তমান দস্যুরা এ নীতি ভাল ভাবেই জানে। কারণ জিনিসপত্র ওদের জাহাজে রেখে এসে ওরা আবার ফিরে এল বিমলদের নৌকায়—যেখানে পাটাতনের ওপর মাঝিমাল্লার দল সারি সারি মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

বিমল ছিল নিজের কামরায়। সুরেশ্বর কোথায় বিমল তা জানে না। একজন বদমাইশকে ছোরা হাতে ওর কামরায় ঢুকতে দেখে বিমল চমকে উঠলো।

লোকটা সম্ভবতঃ চীনাম্যান। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, সার্কাসের পালোয়ানের মতো জোয়ান—নীল ইজের আর একটা বুক-কাটা কোর্টা গায়ে। মুখখানা দেখতে খুব কুশী নয়, কিন্তু কঠিন ও নিষ্ঠুর। ওর হাতের অস্ত্রখানা বিমল লক্ষ্য করে দেখলে ঠিক ছোরা নয়, মালয় উপদ্বীপে যাকে ‘ক্রিস’ বলে তাই। যেমনি চক্চকে তেমনি সেখানা ক্ষুরধার বলে মনে হোল।

সে ক্রিসখানা বিমলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে দেখিয়ে বললে—আমি তোমাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি, কিছু মনে করো না।

বিমলের মুখ বাঁধা, সে কি কথা বলবে?

লোকটা পকেট থেকে একটা চামড়ার থলি বার করে সেটার মুখ খুলে বিমলের চোখের সামনে মেলে ধরলে। শুকনো আমচুরের মতো কতকগুলো কি জিনিস তার মধ্যে রয়েছে। বিমল অবাক হয়ে ভাবছে এ জিনিসগুলো কি, বা তাকে এগুলি দেখানো সার্থকতাই বা কি—এমন সময় লোকটা একটা শুকনো আমচুর বার করে ওর নাকের সামনে ধরে বললে—চিনতে পারলে না কি জিনিস?

বিমল এতক্ষণে জিনিসটা চিনতে পারলে এবং চিনে ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠলো।

সেটা একটা কাটা শুকনো কান, মানুষের কান! লোকটা হা হা করে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে—বুঝেছ এবার? হ্যাঁ, ওটা আমার একটা বাতিক—মানুষের কান সংগ্রহ করা। তোমাকেও তোমার কান দুটির জন্যে একটুখানি কষ্ট দেবো। আশা করি মনে কিছু করবে না। এসো, একটু এগিয়ে এসো দেখি।

বিমল নিরুপায়, মুখ দিয়ে একটা কথা বার করবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই তার। এক মুহূর্তে তার মনে হোল হয়তো সুরেশ্বরের সমানই অবস্থা ঘটেছে, এতক্ষণে তারও অশেষ দুর্দশা হচ্ছে এই পীতবর্ণ বর্করদের হাতে।

বুদ্ধদেবের ধর্মকে এরা বেশ আয়ত্ত করেছে বটে!

লোকটা সময়ের মূল্য বোঝে, কারণ কথা শেষ করেই বুদ্ধশিষ্যের এই বিচিত্র নমুনাটি চক্চকে ক্রিস্থানা হাতে করে এগিয়ে এল—বিমলের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল—মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ বার হতে চেয়েও হোল না, সে প্রাণপণে দুই চোখ বুজলে।

তীক্ষ্ণ ক্রিসের স্পর্শ খুব ঠাণ্ডা—কতটা ঠাণ্ডা, খু-উব ঠাণ্ডা কি? ক্রিসের স্পর্শ এল না, এল তার পরিবর্তে দূর থেকে একটা অস্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ—প্রস্তরময় কূলে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল বেগে আছড়ে পড়ার শব্দের মতো গম্ভীর।

কতকগুলো ব্যস্ত মানুষের সম্মিলিত দ্রুত পদশব্দ বিমলের কানে গেল—বিস্মিত বিমল চোখ খুলে চেয়ে দেখলে লোকটা ছুটে কামরার বাইরে চলে গেল—চারিদিকে একটি সাড়া শোরগোল, কাঠের পাটাতনের ওপর অনেকগুলো পলায়নপর মানুষের দ্রুত পায়ের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।

কি ব্যাপার? এ আবার কি নতুন কাণ্ড?

পরক্ষণেই বিমলের মনে হোল তাদের জাঙ্কখানা একটা প্রকাণ্ড দুলুনি খেয়ে একেবারে কাৎ হয়ে পড়বার উপক্রম করেই পরমুহূর্তে ঢেউয়ের তালে যেন আকাশে ঠেলে উঠলো—নোঙরের শিকলে কড়কড় শব্দে টান ধরলো—মজবুত শেকল না হোলে সেই হেঁচকা টানে ছিঁড়ে যেতেনিশ্চয়ই। একটু পরে বিমলদের নৌকার একজন জোয়ান মাঝি ওর কামরায় ঢুকে হাত-পায়েরবাঁধন কেটে দিলে।

তখনও পাশে কোথায় খুব হৈচৈ হচ্ছে।

বিমল বললে—ব্যাপার কি বল তো? আমার বন্ধুটি কোথায়?

মাঝি বললে—সে ভালই আছে।

বলেই সে বাইরে চলে গেল। বেশী কথা বলে না এদেশের লোক।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে এসে দেখলে সামনে এক অদ্ভুত ব্যাপার। নবাগত বোম্বেটে জাঙ্কখানা কঠিন প্রস্তরময় ডাঙায় ধাক্কা খেয়ে জখম হয়েছে আর অল্প দূরেই সমুদ্রবক্ষে এমন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে যা জীবনে কখনও দেখে নি।

আকাশ থেকে কালো মোটা থামের মতো একটা জিনিস নেমে সমুদ্রের জলে মিশে গিয়েছে—সে জিনিসটা আবার চলনশীল—হালকা রবারের বেলুন বা ফানুসের মতো অত বড় কালো মোটা থামটা বায়ুর গতির সঙ্গে ধীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভেসে চলেছে।

এই সময় সুরেশ্বর ও জাঙ্কের সারেঙ এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো।

সারেং বললে—উঃ, কত বড় জোড়া জলস্তম্ভ, মিস্টার! চীন সমুদ্রে প্রায়ই জলস্তম্ভ হয় বটে কিন্তু এমন জোড়া জলস্তম্ভ আমি কখনো দেখিনি! ঐ জলস্তম্ভটা আজ আমাদের বাঁচিয়েদিয়েছে।

ঐ কালো মোটা থামের মতো ব্যাপারটা তাহলে জলস্তম্ভ! ছবিতে দেখেছে বটে। কিন্তু বিমল বা সুরেশ্বর জীবনে এই প্রথম জিনিসটা দেখলে।

কিন্তু ব্যাপারটা ওরা ঠিকমত বুঝতে পারে নি। জলস্তম্ভ ওদের জীবন বাঁচাল কী করে?

বেশী দেরি হোল না ব্যাপারটা বুঝতে। যখন ওরা দেখলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ সারেঙ নোঙর উঠিয়ে জাঙ্কখানা ডাঙা থেকে প্রায় একশো গজ এনে ফেলেছে এবং প্রতিমুহূর্তেই তীর ও সমুদ্র উভয়ের ব্যবধান বাড়ছে। সারেঙ ও মাঝিদের মুখে শোনা গেল এই জলস্তম্ভের জোড়াটি দ্বীপের অদূরে ভেঙে গিয়ে বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে—তাতে বোম্বেটেদের জাঙ্কখানাকে উর্ধ্বে উঠিয়ে সবেগে আছাড় মেরেছে ডাঙার গায়ে। জাঙ্কখানা জখম তো হয়েছেই এবং বোধ হচ্ছে ওদের কতকগুলি লোককেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে।

সারেং বললে—জলস্তম্ভ ভয়ানক জিনিস, মিস্টার। অনেক সময় জাহাজ পর্যন্ত বিপদে পড়ে যায়—বড় বড় জাহাজ দূর থেকে কামান দেগে জলস্তম্ভ ভেঙে দেয়। আর বিশেষ করে এই চীন সমুদ্রে সপ্তাহে দু-একটা বালাই লেগেই আছে।

দ্বীপ ছেড়ে জাহাজটা বহুদূর চলে এসেছে।

আবার অকূল সমুদ্র।

বোম্বটে জাহাজ ও জলস্তম্ভ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত নীলিমার মধ্যে। সুরেশ্বর ও বিমল চুপ করে সমুদ্রের অপরূপ রঙের দিক চেয়ে বসে আছে।

সারেং এসে বললে—মিস্টার, আমরা হংকং থেকে আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু হংকং যাবো না।

সুরেশ্বর বললে—কোথায় যাবো তবে?

—হংকং থেকে পঞ্চাশ মাইল আন্দাজ দূরে ইয়ান-চাউ বলে একটা ছোট দ্বীপ আছে। সেখানে আপনাদের নামিয়ে দেবার আদেশ আছে আমার ওপর। হংকং-এর কাছে গেলে ব্রিটিশ মানোয়ারী জাহাজ আমাদের নৌকো তল্লাস করবে। তোমরা ধরা পড়ে যাবে মিস্টার!

পরদিন দুপুরের পরে ইয়ান-চাউ পৌঁছে গেল ওদের নৌকো! ক্ষুদ্র দ্বীপ। আগাগোড়া দ্বীপটি যেন একটা ছোট পাহাড়, সমুদ্রের জল থেকে মাথা তুলে জেগে রয়েছে। এখানে চীন গবর্নমেন্টের একটা বেতারের স্টেশন আছে।

সমস্ত দ্বীপে আর কোনো অধিবাসী নেই। ঐ বেতারের স্টেশনের জনকয়েক চীনা কর্মচারী ছাড়া।

দুদিন ওরা সেখানে বেতার আড্ডায় কর্মচারীদের অতিথি হয়ে রইল। তৃতীয় দিন খুব সকালে ক্ষুদ্র একখানা জাহাজে ওদের দশ মাইল দূরবর্তী উপকূলে নিয়ে যাওয়া হোল।

বেতারের এইরকম আদেশই নাকি এসেছে।

এই চীন দেশ! যদি টেউ-খেলানো ছাদ-আঁটা চীনা বাড়ী না থাকতো, তবে চীন দেশের প্রথম দৃশ্যটা বাংলা দেশের সাধারণ দৃশ্য থেকে পৃথক করে নেওয়া হঠাৎ যেতো না।

উপকূল থেকে পাঁচমাইল দূরে রেলওয়ে স্টেশন। অতি প্রচণ্ড কড়া রৌদ্রে পদব্রজেই ওদের স্টেশনে আসতে হোল। এদেশে ওদের জামাই-আদরে কেউ রাখবে না, কঠিন সামরিক জীবন যে এখন থেকেই শুরু হোল ওদের—এ কথাটা সুরেশ্বর ও বিমল হাড়ে হাড়ে বুঝলে সেই ভীষণ রোদে বিশ্রী ধুলোভরা রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

তার ওপর বেতারের কর্মচারীটি ওদের সঙ্গে ছিল, তার মুখেই শোনা গেল, এ সব অঞ্চল আদৌ নিরাপদ নয়।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার গুণ্ডগালের সুযোগ নিয়ে চোর ডাকাত ও গুণ্ডার দল যা খুশি শুরু করেছে। তারা দিনদুপুরও মানে না। স্বদেশী বিদেশীও মানে না। কারো ধন-প্রাণ নিরাপদ নয় আজকাল। দেশ এক প্রকার অরাজক।

শীঘ্রই এর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল পথের মধ্যেই। ওরা একদলে আছে মাত্র চারজন। রৌদ্রে সুরেশ্বরের জলতেপ্তা পেয়েছিল। চীনা কর্মচারীটিকে ও ইংরাজীতে বললে—জল কোথাও পাওয়া যাবে?

রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম বা বস্তি। খানকতক খড়ের ঘর এক জায়গায় জড়ো করা মাত্র। চীনা কর্মচারীর পিছু পিছু ওরা বস্তির দিকে গেল। বিমলের মনে হোল একবার বৈদ্যবাটীর গঙ্গার চরে সে তরমুজ কিনতে গিয়েছিল—এ ঠিক যেন বৈদ্যবাটীর চড়ার চাষী-কৈবর্তদের গাঁ-খানা। একখানা গরুর গাড়ী সামনেই ছিল—তফাতের মধ্যে চোখে পড়লো সেটার গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। গরুর গাড়ীর অত মোটা চাকা বাংলাদেশে হয় না।

ওদের আসতে দেখেই কিন্তু বস্তির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হোল। মেয়ে পুরুষ যে যার ঘর ছেড়ে ছুটে বেরলো—এদিক ওদিক দৌড় দিল। চীনা কর্মচারীও তৎপর কম নয়—সেও ছুটে গিয়ে একটি ধাবমানা স্ত্রীলোকের পথ আগলে দাঁড়ালো।

স্ত্রীলোকটি দু—হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে জড়সড় হয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। ব্যাপারটা কি? সুরেশ্বর ও বিমল অবাক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীলোকের বিপন্ন কণ্ঠের আর্তনাদ বিমল সহ্য করতে পারলে না। ও চোঁচিয়ে বল্লে—ওকে কিছু বলো না মিঃ চংপে—

ততক্ষণে ওদের সঙ্গী চীনা ভাষায় কি একটা বল্লে স্ত্রীলোকটিকে। কথাটা এই রকম শোনালা ওদের অনভ্যস্ত কানে।

—হি চিন্-কিচিন্—চিন্-চিন্—

স্ত্রীলোকটি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে বল্লে—ই চিন্, কি চিন্, সি চিন্—

—কি চিন্, ফি চিন্?

—সি চিন্, লি চিন্।

সুরেশ্বর ও বিমল ওদের কথা শুনে হেসেই খুন। কথাবার্তাগুলো যেন ঐ রকমই শোনাচ্ছিল।

তারপর ওরা স্ত্রীলোকটির কাছে পায়ে পায়ে গেল। আহা, যেন মূর্তিমতী দারিদ্র্যের ছবি! ভারতবর্ষীয় লোকে তবুও স্নান করে, গায়-মাথায় তেল দেয়, এরা তাও করে না—গায়ে খড়ি উড়ছে, মাথা রুক্ষ, শরীর অন্নাভাবে শীর্ণ ও জ্যোতিহীন। হতভাগ্য মহা চীন, হতভাগ্য ভারতবর্ষ! দুজনেই দরিদ্র, কেউ খেতে পায় না,—গুরু শিষ্য দুজনের অবস্থাই সমান।

বিমলের মনে মনে এই দরিদ্রা নারী, এই দরিদ্র, হতভাগ্য, উৎপীড়িত মহা চীনের এই ভয়াব্র্ত, অসহায় কুঁড়েঘরবাসী চাষীমজুর—এদের প্রতি একটা গভীর অনুকম্পা ও সহানুভূতি জাগলো। মানুষ যখন দুঃখকষ্ট পায়, সবদেশে সর্বকালে তারা এক। চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, এদের মধ্যে দেশের সীমা এখানে মুছে গিয়েছে।

এই অভাগিনী ভয়ব্যাকুলা দরিদ্রা নারী সমগ্র চীনদেশের প্রতীক।

বিমল এসেছে এক হতভাগ্য দেশ থেকে—এই হতভাগ্য দেশকে সাহায্য করতে। সে তা যথাসাধ্য করবে। দরকার হোলে বৃকের রক্ত দিয়েও করবে।

স্ত্রীলোকটি যখন বুঝতে পারলে যে এরা ডাকাত নয় বা বিদ্রোহী রেড আর্মির লোকও নয়, তখন সে উঠে ঘরে গিয়ে জল নিয়ে এসে সবাইকে খাওয়ালে।

ধাতুপাত্র বা চীনা মাটির পাত্র নেই বাড়ীতে, এত গরীব সাধারণ লোক। লাউয়ের খোলায় জল রেখেছে।

চীনের বিশ্ববিখ্যাত মাটির বাসন, মিং রাজত্বের অপূর্ব প্রাচীন শিল্প, পুতুল, খেলনা, বুদ্ধ, দানব, এসব এই গরীবদের জন্যে নয়।

রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খুব ভিড়। একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন সিনকিউ থেকে সাংহাই যাচ্ছে—প্রত্যেক স্টেশনে আবার নতুন ভর্তি করা সৈন্যদের ওই ট্রেনেই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুরেশ্বর বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ট্রেনের ছাদের দিকে।

সব কামরার ছাদে কাঁচা ডালপালা চাপানো—কোনোটায় শুকনো খড় বিচালি ছাওয়া।

বিমল বল্লে এরোপ্লেন পাছে বোমা ফেলে ট্রেনে, তাই ওরকম করেছে বলে মনে হয়।

সাংহাই ৪৫০ মাইল দূরে।

হঠর হঠর করে করে সারাদিন ট্রেন কৃষিক্ষেত্র, অনুচ্চ পাহাড়, গ্রাম আর বস্তি পার হয়ে চলেছে, চলেছে। ট্রেনের গতি মন্দ নয়, পুরানো আমলের এঞ্জিন বদলে নতুন এঞ্জিন কেনা হয়েছে, বেশ জোরেই ট্রেন যাচ্ছে।

ওদের কামরাতে সাধারণ সৈন্যদল নেই অবিশি। মাত্র জন আষ্টেক লোক, সবাই অফিসার শ্রেণীর, কিন্তু কেউ ইংরিজী জানে না। মহা অসুবিধেয় পড়ে গেল ওরা—কিছু দরকার হোলে চাওয়া যায় না, নতুন কিছু দেখলে জিগ্যেস করা যায় না যে সেটা কি।

দুপুরের দিকে একটা ছোট শহরে গাড়ী দাঁড়াল এবং ওদের কামরাতে একজন সাদা সরু একগুচ্ছ লম্বা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোক উঠলেন, সঙ্গে তাঁর এগারোটি তরুণ যুবা। এদের সবারই বেশ সুন্দর কমনীয় চেহারা।

বিমল বলল—গুড মর্নিং স্যার।

বৃদ্ধের মুখ দেখে মনে হয় জগতে তাঁর আপন-পর কেউ নেই। তিনি সবাইর ওপর সন্তুষ্ট, জীবনে সবাইকে ভালবেসেছেন।

তিনি হাসিমুখে ইংরিজিতে বললেন—গুড মর্নিং, আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বলল—সাংহাই। আপনারা কি অনেকদূর যাবেন?

—আমরা যাচ্ছি সাংহাই। আমি এখানকার কলেজের প্রোফেসর। আমার নাম লি। আমি সেখানে যাচ্ছি যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে। এদেরও নিয়ে যাচ্ছি, এরা সবাই আমার ছাত্র। সদানন্দ বৃদ্ধ কথা শেষ করে গর্বির্ত দৃষ্টিতে তাঁর এগারোটি তরুণ ছাত্রের দিকে চাইলেন। বিমল ও সুরেশ্বরের বড় অদ্ভুত মনে হোল। এই ভয়ানক দিনে ইনি মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে চলেছেন সাংহাইতে, এতগুলি বালকের জীবন বিপন্ন করে!

একটু পরে বৃদ্ধের একটি ছাত্র একটি বেতের বাক্স থেকে কি সব খাবার বার করে সবাইকে খেতে দিলে। বৃদ্ধ সুরেশ্বর ও বিমলকেও তাঁদের সঙ্গে খেতে আহ্বান করলেন।

সুরেশ্বর নিম্নস্বরে বলল—খেও না বিমল। হাঁদুর ভাজা কিংবা আরশোলা চচ্চড়ি বোধ হয়।

কিন্তু সে সব কিছু নয়। শরবতী লেবুর রস দেওয়া কুমড়োর বীচি ভাজা আর শসার আচার।

বিমল বলল—প্রোফেসর লি, আপনি সাংহাইতে কোথায় উঠবেন? আমাদের সঙ্গে থাকুন না, আমরা যেখানে থাকবো? হঠাৎ এরোপ্লেনের আওয়াজ কানে এল—গাড়ীসুদ্ধ সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জানলার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করলে কোন দিক থেকে আওয়াজটা আসছে।

ছ'খানা এরোপ্লেন সারবন্দী হয়ে উড়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে আসছে। ট্রেনখানার বেগ হঠাৎ বেড়ে গেল। সকলেই উদ্ভিন্ন হয়ে পড়েছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু এরোপ্লেনের সারি ট্রেনের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে চলে গেল শান্তভাবেই।

প্রোফেসর লি দিব্যি নিব্বিকার ভাবেই বসেছিলেন। তিনি বললেন—আমাদের গভর্নমেন্টের এরোপ্লেন।

একটা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে নারীকণ্ঠের কান্না শুনে বিমল ও সুরেশ্বর মুখ বাড়িয়ে দেখলে, কতকগুলি সৈন্য একটি দরিদ্র স্ত্রীলোকের চারিধারে ঘিরে হাসছে—স্ত্রীলোকটির সামনে একটা শূন্য ফলের ঝাড়ি—এদিকে সৈন্যদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা খরমুজ।

বিমল বলল—প্রোফেসর লি, আমরা নতুন দেশে এসেছি, কিছু বুঝিনে এ দেশেরভাষা। বোধ হয় খরমুজওয়ালীর সব ফল এরা কেড়ে নিয়ে দাম দিচ্ছে না! আপনি একবার দেখুন না।

বৃদ্ধ তাঁর এগারোটি ছাত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বাধা দিলেন সৈন্যদের। চীনা ভাষায় তুবড়ি ছুটলো উভয় পক্ষেই।

বৃদ্ধের ছাত্রগণও তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দরকার হোলে মারামারি করবে। মারামারি একটা ঘটতো হয়তো, কিন্তু সেই সময় জনৈক চীনা সামরিক অফিসার গোলমাল দেখে সেখানে উপস্থিত হতেই সৈন্যরা খরমুজ রেখে যে যার কামরায় উঠে বসলো। খরমুজওয়ালী গোটাকতক ফল লি ও তাঁর ছাত্রদের খেতে দিল—বৃদ্ধ তার দাম দিয়ে দিলেন, খরমুজওয়ালীর প্রতিবাদ শুনলেন না।

সন্ধ্যার সময় ট্রেন ফু-চু পৌঁছলো।

ফু-চু থেকে অনেকগুলি সৈন্য উঠলো। ট্রেন কিন্তু ছাড়তে চায় না—খবর পাওয়া গেল, সামনের রেলপথে কি একটা গোলমালের দরুন ট্রেন ছাড়বার আদেশ নেই।

এ দেশে সময়ের কোনো মূল্য নেই। চার পাঁচ ঘণ্টা ওদের ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সৈন্যদল নেমে যে যার খুশি-মতো স্টেশনে পায়চারি করছে, তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপাশের বাজারের মধ্যে ঢুকে হুন্সা করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে।

একটা ছোট ছেলে তারের একরকম যন্ত্র বাজিয়ে গাড়ীতে গাড়ীতে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। প্রোফেসর লি তাকে ডেকে কি জিগ্যেস করলেন, তাকে কিছু খাবার দিলেন। তাঁরই মুখে বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে ছেলেটি অনাথ, স্থানীয় আমেরিকান মিশনে প্রতিপালিত হয়েছিল—এখন সেখানে আর থাকে না।

সন্ধ্যার আগে ট্রেন ছাড়লো। সারারাতের মধ্যে যে কত স্টেশন পার হোল, কত স্টেশনে বিনা কারণে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল—তার লেখাজোখা নেই। এই রকম ধরণের রেলভ্রমণ বিমল ও সুরেশ্বর কখনো করেনি।

ভোরের দিকে ট্রেনখানা এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

বিমল ঘুমুচ্ছিল—ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রেনখানা দাঁড়াতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমল দেখলে দুধারের মাঠে ঘন কুয়াশা হয়েছে, দশহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না—সামনের দিকে লাইনের ওপর আর একখানা ট্রেন যেন দাঁড়িয়ে—কুয়াশায় তার পেছনের গাড়ীর লাল আলো ক্ষীণভাবে জ্বলছে।

প্রোফেসর লি-ও ইতিমধ্যে উঠেছেন।

তিনি বললেন—ব্যাপারটা কি?

বিমল বলল—সামনে দুখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে, এই তো দেখছি। ঘোর কুয়াশা, বিশেষ কিছু দেখা যায় না।

ট্রেন থেকে লোকজন নেমে দেখতে গেল সামনের দিকে এগিয়ে। খুব একটা গোলমাল যেন শোনা যাচ্ছে সামনে।

সুরেশ্বরও উঠেছিল, বলল—চলো বিমল, এগিয়ে দেখে আসি।

প্রোফেসর লি-ও নামলেন ওদের সঙ্গে। দুখানা ট্রেনকে ঘন কুয়াশার মধ্যে অতিক্রম করে রেললাইনের সামনে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়লো তা যেমন বীভৎস, তেমনি করুণ।

সেখানে আর একখানা ছোট সৈন্যবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে—কিন্তু বর্তমানে সেখানাকে ট্রেন বলে চিনে নেওয়ার উপায় নেই বলেই হয়। ছাদ উড়ে গিয়েছে, মোটা মোটা লোহার দণ্ড বেঁকে দুমড়ে লাইনের পাশের খাদে ছিটকে পড়েছে—জানলা-দরজার চিহ্ন বড় একটা নেই। কেবল ইঞ্জিনের কিছু হয় নি। শোনা গেল ট্রেনখানার ওপর বোমা পড়েছে এই কিছুক্ষণ আগে—কিন্তু সুখের বিষয় গাড়ীখানা একদম খালি যাচ্ছিল। এখানা কোনো টাইমটেবলভুক্ত যাত্রী বা সৈন্যবাহী ট্রেন নয়। খালি ট্রেনখানাফু-চু থেকে সাংহাই যাচ্ছিল, ডাউন লাইনে বড় গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে এরকামরাগুলো এই উদ্দেশ্যে। গার্ড ও ড্রাইভার বেঁচে গিয়েছে। কোনো প্রাণহানি হয়নি।

—লাইন পরিষ্কার করতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। মাত্র পনেরো মাইল দূরে সাংহাই, সেখানে পৌঁছুতে বেজে গেল একটা।

সাংহাই-এনেমে বিমল ও সুরেশ্বর বুঝলে এ অতি বৃহৎ শহর; সাংহাই-এর রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও আধুনিক ধরণে তৈরী, বড় বড় বাড়ী, দোকান, হোটেল, আপিস, স্কুল, কলেজ—চীনা ও ইংরাজী ভাষায় নানা সাইনবোর্ড চারিদিকে, মোটরের ও রিকশা গাড়ীর ভিড়, রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য, চায়ের দোকান, চীনা ভাতের দোকানে ছোট বড় হুঁদুর ভাজা ঝোলানো রয়েছে, ফলওয়ালী রাস্তার ধারে বসে ফল বিক্রি করছে—এত বড় শহরের লোকজন ও ব্যবসাবাণিজ্য দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে এই সাংহাই শহরের ওপর বর্তমানে জাপানী সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে আসছে পিকিং থেকে।

কিছু বদলায় নি যেন, মনে হয় প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সহজ ও উদ্বিগ্নশূন্য ভাবেই চলেছে।

এখানে প্রোফেসর লি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। খুব বড় ধূসর রংয়ের সামরিক লরীতে চড়ে ওরা একটা বড় লম্বামতো বাড়ীর সামনে নীত হোল।

বাড়ীটা সামরিক বিভাগের একটা বড় দপ্তরখানা, এ ওদের বুঝতে দেরি হোল না— ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদল ও অফিসারে ভর্তি। প্রতি কামরায় চীনা ভাষায় সাইনবোর্ড আঁটা। অফিসার দল ঢুকছে বেরুচ্ছে, সকলের মুখেই ব্যস্ততার ভাব, উদ্বেগের চিহ্ন।

দু তিন জায়গায় ওদের নাম লেখা হোল—ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে যে চীনা অফিসার, সে প্রত্যেক জায়গায় একটা লম্বা হল্‌দে চীনা ভাষায় লিখিত কাগজ খুলে ধরলে টেবিলের ওপর।

তবুও আইনকানুন শেষ হোল না—অবশেষে একটা কামরার সামনে ওদের দাঁড় করালে। কামরার মধ্যে নিশ্চয় কোনো বড় কর্মচারীর আড্ডা, কারণ কামরার সামনে দর্শনপ্রার্থী সামরিক অফিসার ও অন্যান্য লোকের ভিড় লেগেছে।

ভিড় ঠেলে একটু কাছে গিয়ে বিমল পড়লে দরজার গায়ে পিতলের ফলকে ইংরিজীতে লেখা আছে— জেনারেল চু-সিন্-টে, অফিসার কমান্ডিং নাইন্টিনথ্ রুট আর্মি। ওদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি— জেনারেল সাহেবের কামরায় শীঘ্রই ডাক পড়লো। বড় টেবিলের ওপাশে এক সুশ্রী, সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত যুবা বসে, ইনিই জেনারেল চু-টে, পূর্বের বিদ্রোহী কমিউনিস্ট, সৈন্যদলের নেতা ছিলেন, বর্তমানে জেনারেল চিয়াং-কৈ-শাক-এর বিশিষ্ট সহকর্মী।

হাসিমুখে জেনারেল চু-টে মার্জিত ইংরিজীতে বল্লেন—গুড মর্নিং, আপনাদের কোনো কষ্ট হয় নি পথে?

এরাও হাসিমুখে কিছু সৌজন্যসূচক কথা বল্লেন।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমি ভারতবর্ষের লোকদের বড় ভালবাসি। আপনারা আমাদের পর নন।

বিমল বল্লেন—আমরাও তাই ভাবি।

—মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন? ঐ একজন মস্ত লোক আপনাদের দেশের!

জেনারেল চু-টে'র মুখে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে বিমল ও সুরেশ্বর দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেল। তবে মহাত্মা গান্ধী তো আর ওদের বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী ছিলেন না, সুতরাং তাঁর দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান নেই—তার ওপর ওরা আজ দু'মাস দেশছাড়া।

—ভালই আছেন। ধন্যবাদ—

—মিঃ জহরলাল নেহরু ভাল আছেন? আমি তাঁকে শীগগির একটা চিঠি লিখছি আমাদের দেশের জন্য ভারতের সাহায্য, কংগ্রেসের সাহায্য চেয়ে।

বিমল ও সুরেশ্বরের বুক গর্বে ফুলে উঠলো। একজন স্বাধীন দেশের বীর সেনানায়কের মুখে তাদের দরিদ্র ভারতের নেতাদের কথা শুনে, চীনদেশ ভারতের কাছে সাহায্যপ্রার্থী একথা শুনে ওরা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমার এক সময় অভ্যন্ত ইচ্ছে ছিল ভারতে বেড়াতে যাবো। নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। ভারতে ভাল বৈমানিক তৈরী হচ্ছে? এরোপ্লেন চলাবার ভাল স্কুল কোথাও স্থাপিত হয়েছে?

বিমলেরা এ খবর রাখে না। দমদমায় একটা যেন ঐ ধরনের কিছু আছে—তবে তার বিশেষ কোনো বিবরণ ওরা জানে না।

চু-টে বল্লেন—আপনাদের ধন্যবাদ, এদেশকে আপনারা সাহায্য করতে এসেছেন। আপনাদের ঋণ কখনো চীন শোধ দিতে পারবে না। আপনারা পথ দেখিয়েছেন। আপনাদের প্রদর্শিত পথে দুই দেশের মিলন আরও সহজ হোক এই কামনা করি।

বিমল বল্লেন—এখন কি আমাদের সাংহাইতে থাকতে হবে?

—কিছুদিন। বৈদেশিক মেডিকেল ইউনিট আমেরিকান ডাক্তার ব্রুমফিল্ডের অধীনে। এখন আপনাদের থাকতে হবে মার্কিন কনসেশনে—সাধারণ শহরে নয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চীন গবর্নমেন্ট আপনাদের জীবনের জন্য দায়ী। সাধারণ শহরে বোমা পড়বে, হাতাহাতি যুদ্ধ হবে—এখানে কারো জীবন নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক কনসেশনে আমরা হাসপাতাল খুলেছি। সেখানে আপনারা কাজ করবেন।

—ইওর এক্সেলেন্সি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, যদি বেয়াদবি না হয়!

—বলুন?

—সাংহাই কি জাপানীরা আক্রমণ করবে বলে আপনি ভাবেন?

জেনারেল চু-টে বলেন—এ তো আন্দাজের কথা নয়—সাংহাই-এর দিকেই তো ওরা পিপিং থেকে আসছে। সেন্সি হচ্ছে লুংহাউ রেলের শেষপ্রান্ত। সেখানে আমরা সৈন্য জড় করছি ওদের বাধা দিতে। যাতে উত্তর-পশ্চিম চীনে আর না এগুতে পারে। তবে সাংহাইতে একটা বড় যুদ্ধ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। মেডিকেল ইউনিটের আরও সেইজন্যে সাংহাইতেই এখন দরকার।

সুরেশ্বর ও বিমল অভিবাদন করে বিদায় নিলে।

সৈন্যবিভাগের দপ্তরখানা থেকে বার হয়ে ওরা মোটরে চড়ে আন্তর্জাতিক কনসেশনে পৌঁছলো। বিমল ও সুরেশ্বর লক্ষ্য করলে ব্রিটিশ প্রজা হোলেও ওদের ব্রিটিশ কনসেশনে না নিয়ে গিয়ে ফরাসী কনসেশনে নিয়ে যাওয়া হোল। ওদের সঙ্গে দু'জন চীনা সামরিক কর্মচারী ছিল, আবশ্যিকীয় কাগজপত্র তারাই দেখালে বা সই করলে।

প্রকাণ্ড ব্যারাক। কড়া সামরিক আইন কানুন। হুকুম না নিয়ে কনসেশনের সীমার বাইরে যাবার নিয়ম নেই, ঢোকবারও নিয়ম নেই। ফরাসী সাল্টী রাইফেল হাতে সর্বদা পাহারা দিচ্ছে। ফরাসী জাতীয় পতাকা উড়ছে ব্যারাকের পতাকা মন্দিরে। ওদের যাবার দু'দিন পরে একদল আমেরিকান যুবক কনসেশনে এসে পৌঁছলো—এরা বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এসেছে চীন গবর্নমেন্টকে সাহায্য করতে, নিজেদের সুখ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে, প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে। এদের মধ্যে তিনটি তরুণী ছাত্রীও ছিল, এরা এল সেদিন সন্ধ্যাবেলা। এদের কনসেশনে ঢোকানো নিয়ে চীনা গবর্নমেন্টকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

একটি মেয়ের নাম এ্যালিস্ হুইটবার্ন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিমলের সঙ্গে সে যেচে আলাপ করলে। যেমনি সুশ্রী তেমনি অদ্ভুত ধরনের প্রাণবন্ত, সজীব মেয়ে। কুড়ি একুশ বয়েস—চোখে মুখে বুদ্ধির কী দীপ্তি!

বিমল তাকে বললে—মিস্ হুইটবার্ন, তুমি ডাক্তারীর ছাত্র ছিলে?

মেয়েটি বললে—না। আমি নার্স হবো আন্তর্জাতিক রেড ক্রসে কিংবা চীনা সামরিক বিভাগের হাসপাতালে।

—তোমার বাপ-মা আছেন?

—আছেন। আমার বাবা ঘোড়ার শিক্ষক খুব নাম-করা লোক আমাদের কাউন্টিতে।

—তঁরা তোমাকে ছেড়ে দিলেন?

—তঁদের বুঝিয়ে বললাম। জগতের এক হতভাগ্য জাতি যখন এত দুর্দশা ভোগ করছে, তখন পড়াশুনো বা বিলাসিতা কি ভাল লাগে, আমি আমার সেন্ট আর পাউডারের টাকা জমিয়ে, টকির পয়সা জমিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এদের সাহায্যের জন্যে মার্কিন রেডক্রস্ ফান্ডে। তারপর নিজেই না এসে পারলুম না—তুমিই বলো না মিঃ বোস্, পারা যায় থাকতে?

বিমল মুগ্ধ হয়ে গেল এই বিদেশিনী বালিকার হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পেয়ে। স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে! সংস্কারের পুঁটলি নয়।

মেয়েটা বললে—আমাকে এ্যালিস্ বলে ডেকো। একসঙ্গে কাজ করবো, অত আড়ষ্ট ভদ্র তার দরকার নেই। আমার একখানা ফটো দেবো তোমায়, চলো তুলিয়ে আনি দোন থেকে।

কনসেশনের মধ্যে প্রায়ই সব আমেরিকান দোকান। মেয়েটি বললে, চলো সাংহাই শহরের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি—কোনো চীনা দোকানে ফটো তুলবো। ওরা দু পয়সা পাবে।

অনুমতি নিয়ে আসতে আধঘণ্টা কেটে গেল, তারপর বিমল আর এ্যালিস কনসেশনের বড় ফটক দিয়ে সাংহাইয়ে যাবার রাস্তার ওপর উঠে একখানা রিক্শা ভাড়া করলে।

কনসেশনে রাস্তাঘাটের নাম ইংরাজীতে ও ফরাসী ভাষায়। সাংহাই শহরে চীনা ভাষায়। কিছু বোঝা যায় না। ঢলঢলে নীল ইজের ও স্ট্রি হ্যাট পরে চীনা রিক্শাওয়ালারিক্শা টানছে, কিন্তু এ অংশেও বহু বিদেশী লোক

ও বিদেশী দোকানপসারের সারি। সাংহাই—এর আসল চীনাপল্লী আলাদা—রাস্তা সেখানে আরও সরু সরু— একথা বিমল ইতিমধ্যে চীনা অফিসারদের মধ্যে শুনেছিল।

এ্যালিস্ বঙ্লে—চল চীনাপাড়া দেখে আসি, মিঃ বোস্।

রিক্শাওয়ালাকে চীনাপাড়ার কথা বলতেই সে বারণ করলে। বঙ্লে—সেখানে কেন যাবে। এ সময় সে সব জায়গা ভালো নয়। বিপদে পড়তে পারো। তোমাদের সেখানে নিয়ে গেলে আমরা পুলিশে ধরবে।

এ্যালিস্ ভয় পাবার মেয়েই নয় বঙ্লে—চল, মিঃ বোস্, আমরা হেঁটেই যাবো। ওকে বিপদে ফেলতে চাই নে। ওর ভাড়া মিটিয়ে দিই।

বিমল রিক্শাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দিলে, এ্যালিসকে দিতে দিলে না। কিন্তু রাস্তা দুজনে কেউই জানে না।

বিমল বঙ্লে—একখানা ট্যাক্সি নিই, এ্যালিস্। সে অনেকদূর, রাস্তা না জানলে ঘুরে হয়রান হবো।

হঠাৎ এ্যালিস্, ওপরের দিকে চেয়ে বঙ্লে—ও কি ও, মিঃ বোস্? এরোপ্লেনের শব্দ শুনছো? অনেকগুলো এরোপ্লেন একসঙ্গে আসছে যেন। কোন্‌দিকে বলো তো?

বিমলও শুনলে। বঙ্লে—গবর্নমেন্টের এরোপ্লেন।

কিন্তু চক্ষের নিমেষে একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হলো, যা বিমলের অভিজ্ঞতার বাইরে।

সামনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ওপর বিকট এক আওয়াজ হোল—বাজপড়ার আওয়াজের মতো—সঙ্গে সঙ্গে এদিকে, ওদিকে, সামনে, পিছনে পরস্পর সেই রকম ভীষণ আওয়াজ। ইট্, চুন, টালি চারিদিকে ছুটতে লাগলো। বিরাট শব্দ করে সামনের সেই বাড়ীটার তেতলার ছাদ ধ্বসে পড়লো ফুটপাথের ওপর। বাড়ীধসা চুন সুরকির ধুলোয় ও কিসের ঘন শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ায় বিমল ও এ্যালিসকে ঘিরে ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠলো মানুষের গলার আর্ন্ত চীৎকার, গোলমাল, গোঙানি, কাতর কাকুতি অনুনয়ের শব্দ, দুড়দাড় শব্দে ছুটে চলার পায়ের শব্দ, কান্নার শব্দ, সে এক ভয়ানক কাণ্ড।

বিমল প্রথমটা বুঝতে না পেরে সেই ঘন ধূম আর ধুলির মধ্যে হতভম্বের মত খানিক দাঁড়িয়ে রইল— ব্যাপার কি? তারপরেই বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে এল—এ জাপানী এরোপ্লেনের বোমাবর্ষণ।

এ্যালিস্ কই? একহাতের দূরের মানুষ চোখে পড়ে না, সেই ধোঁয়া ধুলো আর গোলমালের মধ্যে। ওর কানে গেল এ্যালিসের উচ্চ ও সশব্দ কণ্ঠস্বর—মিঃ বোস্, এসো—আমার হাত ধরো—বোমা পড়ছে—দৌড় দাও!

অন্ধকারের মধ্যে বিমল এ্যালিসের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে বঙ্লে—কোথাও নড়ো না এ্যালিস নড়লেই মারা যাবে। দাঁড়াও এখানে।

কিন্তু তখন আর ছুটবার বা পালাবার পথও নেই। পরবর্তী পাঁচ মিনিট কালের ঠিক হিসেব বিমল দিতে পারবে না। সে নিজেও জানে না। বাঁশঝাড়ে আগুন লাগলে যেমন গাঁটওয়ালা বাঁশ ফট্‌ফট্ করে একটার পর একটা ফাটে, তেমনি চারিদিকে দুম্‌দাম্ শুধু বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ।

পায়ের তলায় মাটি যেন দুলাছে, টলছে ভূমিকম্পের মতো—ধোঁয়া, বাড়ী ধসে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, আর্ন্তনাদ—তারপরে সব চুপচাপ, বোমার আওয়াজ থেমে গেল। বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনগুলো মাথার ওপরে চক্রাকারে দু—বার ঘুরে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল—বেশ যেন নিরুপদ্রব, শান্ত ভাবেই।

ধোঁয়ায় মিনিট দুই তিন কিছু দেখা গেল না—যদিও গোলমাল, চীৎকার, লোক জড়ো হওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের তীব্র হুইসেল্ বেজে উঠলো একবার, দুবার, তিনবার।

ক্রমে ধীরে ধীরে ধুলো আর ধোঁয়ার আবরণ কেটে যেতেই এ্যালিস্ বঙ্লে—চলো এগিয়ে গিয়ে দেখি, মিঃ বোস্—

সামনে এক জায়গায় ফুটপাথের ওপর বেজায় লোক জড় হয়েছে। একটা বাড়ী পড়েছে ভেঙে। অতি বীভৎস দৃশ্য ফুটপাথের ওপর। অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ছিন্নভিন্ন দেহ ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেখানটায়। বাড়ীটা বোধহয় একটা চীনা স্কুল ছিল—বেলা এগারোটা, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছিল, কতক ছিল স্কুল-বাড়ীর মধ্যে। বাড়ীখানা একেবারে হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাথ ও রাস্তার খানিকদূর পর্যন্ত।

হর্ন বাজিয়ে দুখানা রেডক্রস এ্যাম্বুলেন্স এল। একটা ছোট ছেলে এখনও নড়ছে—এ্যালিস্ ছুটে তার পাশে গিয়ে বসলো। বিমল এক চমক দেখেই বন্ধে—কোনো আশা নেই মিস্ হুইটবার্ন ও এখুনি যাবে।

বিমলের গা তখনও কাঁপছে। জীবনে এ রকম দৃশ্য কখনো দেখবার কল্পনাও সে করেনি। যুদ্ধ না শিশুপাল বধ!

এ্যালিস্ ও বিমলের কাজ অনেক সংক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আহত কেউ ছিল না—সবাই মৃত।

সব শেষ হয়ে যাবার পরে বিমল বন্ধে—এ্যালিস্, এখন কি করবে? আর কি চীনে পল্লীতে যাবে এখন?

এ্যালিস্ বন্ধে—যেতাম কিন্তু এই যে বোমা-ফেলা হয়ে গেল, এর শোরগোল অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে তো। কনসেশনের সবাই আমাদের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়বে। সুতরাং চলো ফেরা যাক।

কিছুদূরে যেতেই দেখলে হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সটা ছোটোছুটি করছে। চীনা গবর্নমেন্টের এ্যান্টি-এয়ারক্রাফট কামানগুলো চারদিক থেকে ছোঁড়া হতে লাগলো—কিন্তু তখন জাপানী বিমান কোথায়? আকাশের কোনো দিকেই তার পাতা নেই।

ওরা কনসেশনে ফিরে এল। সুরেশ্বরের কাছে বিমল খুব বকুনি খেল, তাকে ফেলে যাওয়ার জন্যে।

এ্যালিস্ বন্ধে—ওকে বকচো কেন—আমি ভেবেছি আজ বিকেলে আবার চীনা পাড়ায়। যাবার চেষ্টা করবো। তুমি চলো না, সুরেশ্বর?

এবার ওদের সঙ্গে আর একটি মেয়ে যাবে বন্ধে। এ্যালিসের সঙ্গে পড়তো, নাম তার মিনি—মিনি বেরিংটন।

বিকেলে ওরা ট্যাক্সি আনালে। ওদের ট্যাক্সি কনসেশনের গেট পর্যন্ত এসেছে—এমন সময় একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী ওদের ট্যাক্সিখানা থামালে।

বন্ধে—আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বন্ধে—শহর বেড়াতে।

—যাবেন না। আমরা গুপ্ত খবর পেয়েছি, জাপানী যুদ্ধজাহাজ বন্দরের বাইরের সমুদ্র থেকে লম্বা পাল্লার কামানে গোলাবর্ষণ শুরু করবে আজ সন্ধ্যার সময়ে—সেইসঙ্গে জাপানী উড়োজাহাজও যোগ দেবে বোমা ফেলতে।

—ধন্যবাদ। আমরা একটু ঘুরে এখুনি চলে আসবো।

একথা বন্ধে এ্যালিস্—কাজেই বিমল বা সুরেশ্বর কিছু বলতে পারলে না। শহরের মধ্যে এসে দেখলে, পুলিশ সকলের হাতে চীনা ভাষায় মুদ্রিত এক টুকরো কাগজ বিলি করছে। চীনা ছাত্রদের একটা লম্বা দল পতাকা উড়িয়ে মুখে কি বলতে বলতে শোভাযাত্রা করে চলেছে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড শহর। এত বড় শহর বিমল দেখে নি—সুরেশ্বরও না। কলকাতা এর কাছে লাগেই না।

চীনা পল্লীর নাম চা-পেই। সে জায়গাটায় রাস্তাঘাট কিন্তু অপরিষ্কার নয়—তবে বড় ঘিঞ্জি বসতি। প্রত্যেক মোড়ে খাবারের দোকান, ছোট বড় হুঁদুর ভাজা ঝুলছে। বাঁকে করে ফিরিওয়ালা ভাত তরকারী বিক্রি করছে।

বিমলের ভারী ভাল লাগলো এই চীনে পাড়ায় জীবনস্রোত। এক জায়গায় একটা বুড়ী বসে ভিক্ষে করচে—টাকা-পয়সার বদলে সে পেয়েছে ভাত তরকারী, ওর মুখে এমন একটি উদার ভালবাসার ভাব, চোখে সন্তোষ ও তৃপ্তির বৃষ্টি, বোধ হয় আশাতীত ভাত তরকারী পেয়েছে বলে এত খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের দারিদ্র্য ও সহজ সরল সন্তোষের ছবি যেন এই বৃদ্ধা ভিখারিণীর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করছে।

হঠাৎ আকাশে কি একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ শুনে ওরা মুখ তুলে চাইলে। একটা চাপা ‘সোঁও-ও-ও’ শব্দ। মিনি সর্বপ্রথমে বলে উঠল—এ শেলের শব্দ! সর্বনাশ, এ্যালিস্ চলো আমরা ফিরি—জাপানী যুদ্ধজাহাজের কামান থেকে শেল ছুঁড়ছে!

দুম্! দুম্!—দূরে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ শোনা গেল।

কাছেই কোথায় একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ হোল সঙ্গে সঙ্গে। লোকজন চারিধারে ছুটতে লাগলো—ওরাও ছুটলো তাদের পিছু পিছু। বসতি যেখানে খুব ঘিঞ্জি, সেখানে একটা বাড়ীতে গোলা পড়েছে। বাড়ীটার সামনের অংশ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—ইট, চুন, টালিতে সামনের রাস্তাটা প্রায় বন্ধ—কে মরেছে না মরেছে বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে লোকজনের বেজায় ভিড়।

আবার সেই রকম ‘সোঁ-সোঁ-ও-ও’ শব্দ!

কাছেই আর একটা জায়গায় গোলা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে সারবন্দী একদল এরোপ্লেন দেখা গেল। তারা অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছে, পাছে চীনা বিমানধ্বংসী কামানের গোলা খেতে হয় এই ভয়ে।

এ্যালিস্ বল্লে—ওরা পাল্লা ঠিক করে দিচ্ছে যুদ্ধজাহাজের গোলন্দাজদের। চলো এখানে আর থাকা নয়— এই চীনা পাড়াটা ওদের লক্ষ্য।

কিন্তু ওদের যাওয়া হোল না। এ্যালিসের কথা শেষ হতে না হতেই যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্পে পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল এবং একসঙ্গে দু’তিনটি শেলের বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ ও সেইসঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া ও বিশ্রী শ্বাসরোধকারী কর্ডাইট-এর উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল। তুমুল হৈ-চৈ, আর্তনাদ, কলরব ও পুলিশের হুইসলের মাঝে এ্যালিসের হাত ধরলে বিমল, মিনির হাত ধরলে সুরেশ্বর, কিন্তু পালাবার পথ নেই তখন কোনো দিকেই। ওদের ট্যাক্সিখানা দাঁড়িয়ে আছে বটে, ট্যাক্সিওয়ালার সন্ধান নেই—সে বোধ হয় পালিয়েছে।

চা-পেই পল্লীর ওপর কেন বিশেষ লক্ষ্য জাপানী তোপের, এ কথা বোঝা গেল না, কারণ এখানে চীনা গৃহসূত্রের বাড়ীঘর মাত্র, কোনো সামরিক ঘাঁটি তো নেই এখানে। দেখতে দেখতে বাড়ীঘর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে পড়ে সামনের পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন আগে যা কিছু মারা পড়েছিল—এখন সবাই পালিয়েছে, কেবল যারা ভাঙা বাড়ীর মধ্যে আটকে পড়েছে তাদেরই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

একটা ভগ্নস্তুপের মধ্যে যেন ছোট ছেলের কান্নার শব্দ। এ্যালিস্ বল্লে—দাঁড়াও বিমল—এখানে সবাই দাঁড়াও।

গোলাবর্ষণ তখনও চলছে, কিন্তু চীনাপল্লীর অন্য অঞ্চলে। এদিকে এখন শুধু গোঙানি, চীৎকার, হৈ-চৈ, কলরব ও কাতরোক্তি।

এ্যালিসআগে চড়লো গিয়ে ধ্বংসস্তুপের ওপরে। পেছনে মিনি ও সুরেশ্বর। বিমল নীচে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কড়িকাঠ সরিয়ে ওরা তিনজনে একটা দরজা পেল। তারপর একটা ছোট ঘর। এ্যালিস্ অতি কষ্টে ঘরে ঢুকলো—সুরেশ্বর ওকে সাহায্য করলে। একটা ন-দশ মাসের শিশু সেই ঘরের মেঝেতে অক্ষত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

এ্যালিস্ তাঁকে সন্তর্পণে মেঝে থেকে তুলে সুরেশ্বরের হাতে দিলে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঘরটার মধ্যে অন্ধকার। তিনজনে ঘরের মধ্যে থেকে ইটকাঠের স্তুপটার ওপরে উঠে শুনলে, বিমল উত্তেজিত ভাবে ডাকছে— আঃ, কোথায় গেলে তোমরা? চট করে নেমে এসো— বড় বিপদ।

চারিদিকের গোলা ফাটবার আওয়াজ ও ছুটন্ত শেলের চাপা ‘সোঁ-ও-ও’ রব খুব বেড়েছে। একটা একটা শেল মাঝে মাঝে আকাশেই সশব্দে ফেটে তারাবাজির মতো অনেকখানি আকাশ আলো করে ছড়িয়ে পড়েছে।

এ্যালিস্ বল্লে—কি হয়েছে?

বিমল বল্লে—জাপানী সৈন্যদল যুদ্ধজাহাজ থেকে নেমেছে শহরে—তারা শহর আক্রমণ করেছে শুনছি। এইদিকেই আসছে। তাদের হাতে পড়া আদৌ আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে না— তোমার হাতে ওকি?

মিনি বল্লে—একটা ছোট্ট ছেলে। একে কোথায় রাখি বলো তো এখন?

সুরেশ্বর একজন ব্যস্ত ও উত্তেজিত পুলিশম্যানকে জিগ্যেস করে জানলে—সমুদ্রের ধারে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। জাপানীরা নগরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে।

এ্যালিস্ বল্লে—আমরা এখন ছোট ছেলেটিকে কোথায় রাখি বলো না? কন্সেশনের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। ওর বাপ-মা এই অঞ্চলের অধিবাসী। ছেলের সন্ধান পাবে না কন্সেশনে নিয়ে গেলে।

বিমল বজ্জে—পুলিশম্যানদের জিম্মা করে দাও না।

এ্যালিস্ ও মিনি তাতে রাজি হোল না। এই সব চীনা পুলিশম্যান দায়িত্বজ্ঞানহীন, ওদের হাতে ছোট ছেলেকে ওরা দেবে না।

সমস্ত গলিটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—লোকজন অন্ধকারে তার মধ্যে কি সবখুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময়ে পাশের একটা স্তূপে দু'তিনটি হারিকেন লণ্ঠন ও টর্চ জ্বালিয়ে একদল ছোকরা একটা মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে বার করছে দেখা গেল।

বিমল উত্তেজিত সুরে বলে উঠলো—প্রোফেসর লি! প্রোফেসর লি!

তারপরেই সে ছুটে গেল ছোকরার দলের দিকে। সুরেশ্বর দেখলে ছোকরার দলের নেতা হচ্ছেন দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ—এবং তিনি তাদের পূর্বপরিচিত প্রোফেসর লি।

সেই মুমূর্ষুদের আর্তনাদ ও পথের লোকের চীৎকারের মধ্যে তিনজনের ব্যাকুল প্রশ্ন বিনিময় হোল। প্রোফেসর লি তাঁর ছাত্রদল নিয়ে নিকটেই এক সরাইখানায় ছিলেন—হঠাৎ এই বোমাবর্ষণের দুর্যোগ—এখন তিনি সেবাব্রতী, ছাত্রদের নিয়ে হতাহতদের টেনে বার করা ও তাদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

এ্যালিস্ ও মিনির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো।

বিমল বজ্জে—প্রোফেসর লি, এই ছোট ছেলেটির কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?

সদানন্দ, সৌম্য বৃদ্ধ হাত পেতে বজ্জন—আমায় দাও। তোমরা ওর বাপ—মায়ের সন্ধান করতে পারবে না, আমি পারবো। আর কি জানো, ছেলে অনেকগুলো জমেছে—চ্যাং, এদের নিয়ে চলো তো? দেখবে এসো তোমরা—

যাবার পথে একটু দূর গিয়েই বিমল বলে উঠলো—আঃ, কি ব্যাপার দেখ!

সকলেই দেখলে, সে দৃশ্য যেমন বীভৎস তেমনি করুণ। সেই বৃদ্ধা ভিখারিণী ঠ্যাং ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে—সেই জায়গাতেই। একখানা হাত প্রায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—পাশেই তার ভিক্ষালব্ধ ভাত-তরকারিগুলো রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে। আশার জিনিসগুলো মুখেও দিতে পারেনি হয়তো!

এ্যালিসের চোখে জল এল। বিমল ও সুরেশ্বর মাথার টুপি খুলে বসল। মিনি চোখে রুমাল দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। কেবল অবিচলিত রইলেন প্রোফেসর লি। তিনি ছাত্রদের বজ্জন, এই মড়াটাকে একটা কিছু দিয়ে ঢাকা দাও তো হে! এ আর কি, আমাদের দেশের এ তো রোজকার ব্যাপার! এতে বিচলিত হোলে চলে না মাদাম!

নিকটেই একটা ঘরের মধ্যে প্রোফেসর লি ওদের নিয়ে গেলেন। হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল সে ঘরের মেঝেতে পাঁচ ছয়টি নয় দশ মাসের কি এক বছরের শিশু অনাবৃত মেঝের ওপর পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে!

এ্যালিস্ ছুটে গিয়ে তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বজ্জে—ও ইউ পুওর ডিয়ারিজ।

প্রোফেসর লি হেসে বজ্জন-সন্ধ্যা থেকে এতগুলো উদ্ধার করেছি স্তূপ থেকে। আপনাদেরটিও দিন। আমার দুটি ছাত্র এখানে পাহারা দিচ্ছে—আমরা খুঁজে এনে এখানে জড়ো করছি—রাখো এখানে।

গোলমাল ও ভিড় তখন একটু কমেছে।

প্রোফেসর লি সকলকে বজ্জন—আসুন, একটু চা খাওয়া যাক—রাত্রে আর ঘুম হবে না আজ, সারারাত এই রকম চলবে দেখছি—

যে ঘরে শিশুগুলিকে জড়ো করা হয়েছে, তার পার্শ্বেই একটা ছোট বাড়ীতে লি থাকেন তাঁর ছাত্রবৃন্দ নিয়ে। দুজন ছাত্রকে শিশুদের কাছে রেখে বাকী সকলে ওদের নিয়ে গেল তাদের সেই বাসায়।

ছোট ছোট পেয়ালায় দুধ-চিনি-বিহীন সবুজ চা, শসার বিচি ভাজা, শরবতী লেবুর টুকরো এবং বাঙালী মেয়েদের পায়জোড়ের মতো দেখতে, শুয়োরের চর্বিতে ভাজা এক প্রকার কি খাবার।

সুরেশ্বর ও বিমল শেষোক্ত খাবার ঠেলে রেখে দিলে, সে কি এক ধরনের বিশ্রী গন্ধ খাবারে!

প্রোফেসর লি বজ্জন—আপনারা বিদেশী। আমাদের দেশকে সাহায্য করতে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এখনও কিছুই দেখেন নি, দেখলে দয়া হবে। এত গরীব দেশ আরএমন হতভাগ্য—

মিনি বজ্জে—আমাদের সব দেখাবেন দয়া করে প্রোফেসর লি। দেখতেই তো এসেছি—

এ্যালিস্ বঙ্লে—আর একটা দেশ আছে প্রোফেসর লি। ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় পড়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দুঃস্থ ভারতবর্ষের কথা শুনলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।

বিমল এ্যালিসের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে চাইলে—বড় ভাল লাগলো এই বিদেশিনী বালিকার এই নিষ্কপট নিঃস্বার্থ সহানুভূতি তার দরিদ্র স্বদেশের জন্যে।

এ্যালিস্ বঙ্লে—শিশুগুলির কে আছে? পুওর লিটল মাইটস! আমায় একটা খোকা দেবেন। প্রফেসর লি?

প্রোফেসর লি হেসে বঙ্লে—কি করবে মিস্—

এ্যালিস্ বঙ্লে—আমাদের নাম ধরে ডাকবেন প্রোফেসর লি, ওর নাম মিনি, আমার নাম এ্যালিস্। আমরা আপনাকে দাদু বলে ডাকবো—কেমন?

এই সদানন্দ উদার সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধকে এ্যালিসের বড় ভাল লেগে গেল। কিউরিও দোকানে বিক্রি হয় যে চিনে মাটির হাস্যমুখ বৃদ্ধ—বৃদ্ধের মুখখানায় ঠিক যেন তেমনি পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও প্রেমের ভাব মাখানো।

প্রোফেসর লি'র মুখ উদার হাসিতে ভরে গেল। বঙ্লে—বেশ তাই হবে।

একটা বড় রকমের আওয়াজের দিকে এই সময় প্রোফেসর লি'র জনৈক ছাত্র ওদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলে।

বিমল বঙ্লে—বন্দরের দিকে এখনও গোলাবর্ষণ চলছে, হাতাহাতি যুদ্ধও চলছে—

ঠিক এই সময় পুলিশম্যান ঘরের দোরের কাছে এসে চীনাভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে—লোকটা যেন খুব ব্যস্ত ও উত্তেজিত—সে চলে গেলে প্রোফেসর বঙ্লে—ও বলে গেল খাওয়া দাওয়া শেষ করে কেউ যেন আজ ঘরের বার না হয়—বিশেষতঃ মেয়েরা। জাপানীরা বেওনেট চার্জ করেছিল—আমাদের সৈন্যরা হটিয়ে দিয়েছে শেনসু প্রাচীরের পূর্ব কোণে। কিন্তু আজ রাত্রেআবার ওরা গোলা মারবে, বোমাও ছুঁড়বে।

চা-পান শেষ হোল। বিমল বঙ্লে—প্রোফেসর লি, মেয়েরা রয়েছেন সঙ্গে, আজ যাই। কন্সেশনে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

এ্যালিস্ বঙ্লে—দাদু, আমার একটা খোকা?

প্রোফেসর লি এ্যালিসের মাথায় হাত দিয়ে খেলার ছলে সম্মেহে বঙ্লে—বেওয়ারিশ যদি কোনো খোকা থাকে, পাবে এ্যালিস্। কিন্তু কি করবে চীনা ছেলে নিয়ে?

এ্যালিসের এ হাস্যকর অনুরোধ শুনে মিনি তো হেসেই খুন।

—চল চল এ্যালিস্, কন্সেশনে একটা জ্যান্ত খোকা নিয়ে তোমায় ঢুকতেই দেবে কি?

ওরা যখন ফিরে আসছে, দূরে মাঝে মাঝে দুম্‌দাম বিস্ফোরণের শব্দ এবং সাহায্যকারী এরোপ্লেনের হাউইয়ের সাদা অগ্নিময় ধূম দেখা যাচ্ছিল। তবে যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

সেই রাত্রে কিসের বিষম আওয়াজে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল—সে ধড়মড় করে উঠে বিছনার ওপর বসলো—কর্ডাইটের শ্বাসরোধকারী ধূমে ও বিশ্রী গন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে।

ও ডাকলে—সুরেশ্বর—সুরেশ্বর—ওঠো—কন্সেশনে বোমা পড়ছে!

সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট হৈ-চৈ উঠলো চারিদিকে।

বোমা! বোমা!

ওরা জানালা দিয়ে দেখলে, যে-ঘরের মধ্যে ওরা শুয়েছিল—তার পূর্বদিকে আর একটা ঘরের দেওয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে এ্যালিস্ ছুটতে ছুটতে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকলে—বিমল! বিমল!

বিমল বঙ্লে—এই যে এ্যালিস্, তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি? মিনি কোথায়?

বলতে বলতে মিনিও ঘরে ঢুকলো। বঙ্লে—বাইরে এসো, দেখো শীগগির—চট করে এসো—

ওরা বাইরে গেল। কনসেশনের পুলিশের ডেপুটি মার্শাল এসে পৌঁছেছেন দুর্ঘটনার স্থানে। সবাই আকাশের দিকে চাইলে, দুখানা এরোপ্লেন চলে যাচ্ছে—আলো নিবিয়ে। জনৈক ফরাসী কর্মচারী দেখে বললে—কাওয়াসাকি বম্বার!

বিমল বললে—এ্যালিস্, কি করে চেনা গেল জিজ্ঞেস করে না?

মিনি বললে—আমি জানি। নীচের দিকে উইং—এ কালো আঁজি কাটা ছুঁচোমুখ প্লেন, এই হোল জাপানীদের বিখ্যাত বোমা ফেলবার প্লেন কাওয়াসাকি বম্বার। কিন্তু কনসেশনে বোমা! এরকম তো কখনো—

সে রাতে আর কারো ঘুম হোল না। বিমল খুব খুশী না হয়ে পারলে না, তার মঙ্গলা-মঙ্গলের দিকে এ্যালিসের এত আগ্রহদৃষ্টি দেখে। সেই রাতে বোমা পড়েছে শুনে এ্যালিস সকলের আগে এসেছে তাকে দেখতে, সে কেমন আছে!

শেষ রাতের দিকে সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু শোরগোলে ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

ভীষণ গোলাবর্ষণের শব্দ আসছে—সাংহাই শহরে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ ও এরোপ্লেন থেকে একযোগে গোলা ও বোমা বৃষ্টি হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই শহর থেকে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে পালিয়ে আসছে কনসেশনে—বাক্স তোরঙ্গ, পোঁটলা পুটলি নিয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে। এদের সবারই মুখে ভীষণ ভয়ের চিহ্ন—এদের চক্ষু উদ্বেগে ও রাত্রি জাগরণে রক্তবর্ণ, চুল রক্ষ; পাশব বলের কাছে মানুষের কি শোচনীয় পরাজয়!

বেলা দশটার মধ্যে ব্রিটিশ কনসেশনের হাসপাতাল ও মার্কিন রেডক্রসের বড় হাসপাতাল আহতের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কি ভীষণ আওয়াজ ও গোলমাল পেন্সু প্রাচীরের দিকে, সমুদ্রের থেকে মাইল দুই দূরে পূর্ব কোণে। সেখানে চীনা টেস্ট-রুট আর্মির সঙ্গে জাপানী নৌ-সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে। কনসেশন থেকে যুদ্ধস্থলের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল, বিমল জিজ্ঞেস করে জানলে। এ ছাড়াও গোলাবর্ষণ চলছে শহরের বিভিন্ন স্থানে।

টেলিফোনে অর্ডার এল মেডিকেল ইউনিটের বড় ডাক্তারের কাছ থেকে—বিমল, সুরেশ্বর, এ্যালিস্ ও মিনিকে চ্যাং-লীন এ্যাভিনিউতে চীনা সামরিক হাসপাতালে যাবার জন্যে।

ওরা আমেরিকান রেডক্রসো মোটরে সামরিক হাসপাতালের দিকে ছুটলো। ড্রাইভার খুব বড় একটা রেডক্রস পতাকা গাড়ীর বনেটে উড়িয়ে দিলে—এ ছাড়া গাড়ীর ছাদের বাইরের পিঠে সারা ছাদ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড লাল ক্রস আঁকা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও ড্রাইভার বললে—যদি আপনারা হাসপাতালে পৌঁছতে পারেন, সে খুব জোর বরাত বুঝতে হবে আপনাদের।

সুরেশ্বর ও বিমল একযোগে বললে—কেন?

—কনসেশন বা রেডক্রস কিছই মানছে না। জাপানী বোমারু প্লেন কালও আমাদের রেডক্রস ভ্যানে বোমা ফেলেছে—শোনেন নি আপনারা সে কথা?

সেকথা না শোনাই ভাল। ওদের মোটর কনসেশন থেকে বার হয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ দিয়ে তীর বেগে ছুটলো। বিমল দেখলে ড্রাইভার মাঝে মাঝে উপরের দিকে উদ্ভিন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে কি দেখছে।

বিমল বললে—কি দেখছে?

—বোমারু প্লেন আসছে কিনা দেখছি। এখন আপনাদের পৌঁছে দিতে পারবো কিনা জানি নে—তবে চেষ্টা করবো—

বলতে বলতে একখানা এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর। বিমলের মুখশুকিয়ে গেল। সামনে উদ্যত মৃত্যুকে কে না ভয় করে? সবাই ওপরের দিকে চাইলে। ড্রাইভার অ্যাক্সিলারেটর পা দিয়ে চেপে স্পীড তুললে হঠাৎ বেজায়।

বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনখানা যেন আরও নীচে নামলো—কিন্তু ভাগের জোরেই হোক বা অন্য কারণেই হোক—শেষ পর্যন্ত সেখানা ওদের ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

ড্রাইভার বন্ধে—জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার—ভীষণ জিনিস—নীচু হয়ে দেখলে এ গাড়ীতে চীনেম্যান আছে কিনা, থাকলে বোমা ফেলতো।

সুরেশ্বর বন্ধে—উঃ, কানের কাছ দিয়ে তীর গিয়েছে।

এতক্ষণ যেন গাড়ীর সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল, এইবার একযোগে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

হাসপাতালে পৌঁছে দেখলে, সেখানে এত আহত নরনারী এনে ফেলা হয়েছে যে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই। এদের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা। যুদ্ধের সৈন্যও আছে—তবে তাদের সংখ্যা তত বেশী নয়।

একটি দশ এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর-মুখ বালকের একখানা পা একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে—আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটি তখনও বেঁচে আছে এবং কিছুক্ষণ আগে অজ্ঞান হয়ে থাকলেও এখন তার জ্ঞান হয়েছে এবং যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করছে। বিমলের ওয়ার্ডেই সে বালকটি আছে। এ্যালিস্ সেই ওয়ার্ডেই নার্স।

এ্যালিস্ পেশাদার নার্স নয়, বয়সেও নিতান্ত তরুণী, চোখের জল রাখতে পারলে না ছেলেটির যন্ত্রণা দেখে। বিমলকে বন্ধে—একে মরফিয়া খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো না?

বিমল বন্ধে—তা উচিত হবে না। ওকে এখনি ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান করে পা কেটে ফেলতে হবে। অপারেশন টেবিল একটাও খালি নেই, সব ভর্তি। একটা টেবিল খালি পেলেই ওকে চড়িয়ে দেবো।

এ্যালিস্ বালকটির শিয়রে বসে কতরকমে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে—কিন্তু ওদের সবারই মুশকিল, চীনা ভাষা সামান্য এক আধটু বুঝতে পারলেও বলতে আদৌ পারে না।

সুরেশ্বর হাসপাতালে ঔষধালয়ে সহকারী কম্পাউন্ডার হয়েছে। সে দুখানা চীনা বর্ণপরিচয় কোথা থেকে যোগাড় করে এনে ওদের দিয়েছে। এ্যালিস্ বন্ধে—সুরেশ ঠিক বলছিল সেদিন, এসো তুমি, আমি, মিনি ভাল করে চীনে ভাষা শিখি, নইলে কাজ করতে পারবো না—

আর্ত বালকটির শয়নশিয়রে এ্যালিস্কে যেন করুণাময়ী দেবীর মতো দেখাচ্ছে, বিমল সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এ্যালিসের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মনে ভরে উঠলো।

সন্ধ্যা সাতটার সময় টেবিল খালি হোল।

বালকটিকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েছে, কতকগুলি ডাক্তারী ছাত্র কিছুদূরে একটা গ্যালারিতে বসে আছে, হাসপাতালের সহকারী সার্জন চীনা ম্যান, তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে কি বলছেন আর একজন ছাত্র ক্লোরোফর্ম পাম্প করছে। বিমল ও এ্যালিস্ সার্জনকে সাহায্য করবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। সার্জন হেসে বললেন, সকাল থেকে অপারেশনে টেবিলে মরেছে একুশটা, টেবিল থেকে নামবার তর সময় নি—গরম জলটা সরিয়ে দাও নার্স—

এমন সময়ে মাথার ওপরে কোথায় এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

বাইরে যারা ছিল তারা দৌড়ে ভেতরে এল, একটা ছুটোছুটি শুরু হোল চারিদিকে। কে একজন বন্ধে—জাপানী বম্বার!

এ্যালিসবন্ধে—রেডক্রসের লাল আলো জ্বলছে বাইরে—হাসপাতাল বলে বুঝতে পারবে—

সার্জন হেসে বন্ধে—নার্স, ওরা কি কিছু মানছে?—শক্ত করে ধরে থাকো তুলোটা—

বালক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সার্জন ক্ষিপ্র ও কৌশলী হাতে ছুরি চালাচ্ছেন। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বুম্-ম্-ম্-ম্!—বিকট বিস্ফোরণের শব্দ কোথাও কাছেই। তুমুল গোলমাল হৈ-চৈ আর্তনাদ, হাসপাতালের বাঁ দিকের অংশে বোমা পড়েছে। উগ্র ধোঁয়া ও নাইট্রোগ্লিসিরিনের গন্ধে ঘর ভরে গেল। সার্জন, বিমল বা এ্যালিসের দৃষ্টি কোনোদিকে নেই—ওরা একমনে কাজ করছে। সার্জন দৃঢ় অবিকম্পিত হস্তে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন তাঁর অপারেশন টেবিলের থেকে একশো গজের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে নি, যেন তিনি মোটা ফি নিয়ে বড়লোক রোগীর বাড়ী গিয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে ব্যস্ত : গরম জলের পাত্রে ডোবানো ছুরি ফরসেপ ছুঁচ ক্ষিপ্রহস্তে একমনে সার্জনকে যুগিয়ে চলেছে এ্যালিস্, একমনে ব্যাণ্ডেজের সারি গুছিয়ে রাখছে, পাতলা লিন্ট-কাপড়ে মলম মাখাচ্ছে। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বাইরে বিকট শব্দ—ছড়মুড় করে হাসপাতালের বাঁ দিকের উইং-এর ছাদ ভেঙে পড়লো। মহাপ্রলয় চলেছে সেদিকে—

সার্জন বল্লে—নাড়ীর বেগ কত?

বিমল—সত্তর।

কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—স্যার, বাঁদিকের উইং গুঁড়ো হয়ে গোটা সেপ্টিক ওয়ার্ডের রোগী চাপা পড়েছে—এদিকেও বোমা পড়তে পারে—তিনখানা বম্বার—

সার্জন বল্লে—পড়লে উপায় কি? নার্স বড় ফরসেপটা—

উগ্র ধোঁয়ায় সবারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আর একটা শব্দ অন্য কোনদিকে হোল—আর একটা বোমা পড়েছে—বেজায় ধোঁয়া আসছে ঘরে।

বিমল বল্লে—স্যার, ধোঁয়ায় রোগী দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে যে? ক্লোরোফর্মের রোগী, এ ভাবে কতক্ষণ রাখা যাবে?

সার্জন ছুরি ফেলে বল্লে—হয়ে গিয়েছে। লিন্ট দাও, নার্স।

বিমল বল্লে—স্যার, রোগীর নাড়ী নেই। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সার্জন এসে নাড়ী দেখলেন। এ্যালিস্ নীরবে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নাড়ী থেকে হাত নামিয়ে সার্জন গম্ভীর মুখে বল্লে—বাইশটা পুরলো।

এ্যালিস্ নিষ্পন্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে বল্লে—চলো নার্স স্ট্রেচারওয়ালারা এসে লাশ নিয়ে যাবে— এখন সবাই বাইরে চলো যাই—

ওপরওয়ালার আদেশ পেয়ে বিমল আগে এ্যালিসের কাছে এল এবং তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে ধুমলোক থেকে উদ্ধার করে ডানদিকের বড় দরজা দিয়ে কম্পাউন্ডের খোলা হাওয়ায় নিয়ে এল।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেই এ্যালিস্কে বল্লে—ঐ দেখ এ্যালিস্, তিনখানা জাপানী বম্বার!

এগারো ঘণ্টা সমানে ডিউটিতে থাকবার পর বিমল, এ্যালিস্, সুরেশ্বর ও মিনি বাইরের ফুটপাথে পা দিলে।

চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউ প্রসিদ্ধ দেশনায়ক চ্যাং সো লীনের নামে হয়েছে—রেডশার্টদের প্রভাবে। সাংহাইয়ের মধ্যে এটা একটি প্রসিদ্ধ রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুটপাথে শামিয়ানার নীচে চা ও শুয়োরের মাংসের দোকান। লোকজনের বেজায় ভিড়।

এই এ্যাভিনিউয়ের ধারেই গভর্নমেন্ট হাসপাতাল। ওরা যখন ফুটপাথে পা দিলে, তখন হাসপাতালের বাঁ অংশে মহা হৈ-চৈ চলছে। সেপ্টিক-ওয়ার্ড জাপানী বোমায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে— সম্ভবতঃ একটা রোগীও বাঁচে নি সে ওয়ার্ডের।

মিনি দেখতে যাচ্ছিল—বিমল বারণ করলে।

—ওদিকে গিয়ে দেখে আর কি হবে মিনি? চলো আগে কোথাও একটু গরম চা খাওয়া যাক।

বোমা ফেলা ও হত্যা ব্যাপারটা দেখে ক’দিনে ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু ওদের নয়, সাংহাই-এর লোকজন, দোকানী, পথিকদেরও। নতুবা গত আধঘণ্টা ধরে হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণ চলছে, চোখের সামনে এই ভীষণ প্রলয়লীলা ও মাথার ওপরে চক্রনকারে উড়নশীল তিনখানা জাপানী বম্বারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউর চায়ের দোকান, মাংসের দোকান, ভাত-তরকারীর দোকান সব খোলা। লোকজনের দিব্যি ভিড়।

রাত পৌনে আটটা।

হঠাৎ এ্যালিস্ জিগেস করলে—ছেলেটি মারা গেল, তখন ক’টা?

বিমল বল্লে—ঠিক সাড়ে সাতটা। ওকথা ভেবো না এ্যালিস্। চল আর একটু এগিয়ে। এক্ষুনি লাশ নিয়ে যাওয়ার ভ্যান আসবে হাসপাতালে। আমরা একটু তফাতে যাই।

একটা শামিয়ানার নীচে ওরা চা খেতে বসলো।

দোকানের মালিক একজন রোগা চেহারার চীনা স্ত্রীলোক। সে এসে পিজিন ইংলিশে বললে— কি দেবো?

বিমল বললে—খাবার কি আছে?

—ভাজা মাছ, রুটি, মাখন আর ব্যাণ্ডের—

—থাক থাক, রুটিমাখন ভাজা মাছ নিয়ে এসো—

রুটি-মাখন অন্যত্র চীনা দোকানে পাওয়া যায় না; তবে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউর দোকানগুলো কিছু শৌখীন ও বিদেশী-ঘেঁষা। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিমল একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললে। সুরেশ্বর তো গোথাসে রুটি ও মাখনের সদ্যবহার করতে লাগলো, খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই।

মিনি বললে—একটা গল্প বলি শোনো সবাই। আমি তখন স্কুলে পড়ি, মেল্টোনে, ক্যালিফোর্নিয়ায়। আমার বাবা আমায় একটা চিন্চিলা কিনে দিয়েছিলেন—

সুরেশ্বর বললে—সে কি?

মিনি হেসে বললে—জানো না? একরকম ছোট কাঠবিড়ালির চেয়ে একটু বড় জানোয়ার, খুব চমৎকার লোম গায়ে—লোমের জন্যে ওদের শিকার করা হয়। তারপর আমার সেই পোষা চিন্চিলাটা—

বুম্-ম্-ম্!—বিকট আওয়াজ।

সবাই চমকে উঠলো। তিনখানা বাড়ীর পরে একটা বাড়ীর ওপরে জাপানী বম্বার ঘুরছে দেখা গেল—কিন্তু ধোঁয়া উড়ছে বাড়ীটার সামনের রাস্তা থেকে। লোকজন দেখতে দেখতে যে যেখানে পারলে আড়ালে ঢুকে পড়লো। একটু পরে একখানা রিক্শা টেনে দুজন লোককে সেদিক থেকে ওদের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেল—রিক্শায় আধশোয়া আধবসা অবস্থায় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। তার মুখটা খেঁৎলে রক্ত গড়িয়ে বুকের সামনে জামাটা রাঙিয়ে দিয়েছে।

শামিয়ানার নীচে আরও তিনটি চীনা খদ্দের বসে চা খাচ্ছিল। তারা উত্তেজিত ভাবে চীনা ভাষায় দোকানীকে কি বললে। দোকানীও তার কি জবাব দিলে, তারপরে ওদের মধ্যে একজন একটা সিগারেট ধরালো।

জাপানী বোম্বার প্লেন ঘড় ঘড় শব্দ করে যেন ওদের মাথার ওপর ঘুরছে। বিমল একবার চেয়ে দেখলে নাঃ, একটু দূরে বাঁদিকে। ঠিক মাথার ওপরে নয়।

মিনি বললে—তারপর শোনো, আমার সেই চিন্চিলাটা—

এ্যালিস্ অধীরভাবে বললে—আঃ মিনি, যাক চিন্চিলার গল্প। খাও এখন ভাল করে। আমার তো বেজায় ঘুম পাচ্ছে। বিমল, দোকানীকে জিগ্যেস করো না, স্যান্ডউইচ রাখে না?

বিমল বললে—ব্যাণ্ডের মাংসের স্যান্ডউইচ আছে বলছে এ্যালিস্—দিতে বলবো?

সুরেশ্বর ও মিনি একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের খাবার জায়গাটা তীব্র সার্চলাইটের আলোয় আলো হতেই ওরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। ভীষণ ধ্বংসের যন্ত্র সেই চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জাপানী বম্বারখানা থেকে রাস্তার যে অংশে ওরা বসে চা খাচ্ছে, সে দিকে সার্চলাইট ফেলেছে।

সুরেশ্বর ও মিনি একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের খাবার জায়গাটা তীব্র সার্চলাইটের আলোয় আলো হতেই ওরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। ভীষণ ধ্বংসের যন্ত্র সেই চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জাপানী বম্বারখানা থেকে রাস্তার যে অংশে ওরা বসে চা খাচ্ছে, সে দিকে সার্চলাইট ফেলেছে।

দোকানী চীনা স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে উঠে কি বললে।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়ুহুড়ু দুড়ুদুড়ু শব্দ—তিনজন চীনা খদ্দের ও রাস্তার পথিকদের মধ্যে জনদুই ছুটে এসে বিমলদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়লো।

মিনি বললে—আঃ, এগুলো কি বোকা! টেবিলের তলায় বাঁচবে এরা? আমার পেয়ালাটা উল্টে ফেলে দিলে মাঝ থেকে—

এ্যালিস্ বললে—আমারও। দোকানী, তোমার চায়ের দাম নিয়ে নাও, আমরা অন্য জায়গায় চা খেতে যাই—এ কি রকম উপদ্রব?

বিমল বন্ধে—ঠিক তো! মহিলাদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে উৎপাত! বোমা খাবি রাস্তায় দাঁড়িয়ে খা ভদ্রলোকের মতো—

মিনি হঠাৎ আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে বন্ধে—ঐ দেখো, দেখো—

তিনখানা চীনা এরোপ্লেন তিন দিকে জাপানী বম্বরখানাকে তাড়া করছে। একখানা চীনা প্লেন বম্বরখানার খুব কাছে এসে পড়েছে—একটু পরেই সেখানা থেকে মেসিনগানের পট পট আওয়াজ শোনা গেল—পিছনের আর একখানা চীনা সাহায্যকারী প্লেন ওদের ওপরে নীলাভ তীব্র সার্চলাইটফেলতেই জাপানী বম্বরখানা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

ততক্ষণ সবাই আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে আকাশের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা দেখছে। আরও দুজন চীনা খব্বের অন্য টেবিলে চা খেতে বসে গেল। দোকানী স্ত্রীলোকটি তাদের খাবার দিলে। মিনি তাদের টেবিলের দিকে চেয়ে বন্ধে—ওই ওরা ব্যাণ্ডের স্যান্ডউইচ খাচ্ছে—

মেসিনগানের আওয়াজ তখন বড় বেড়েছে। জাপানী প্লেনখানা পাক দিয়ে ঘুরছে। হঠাৎ পালাবে না।

বিমল বন্ধে—না, একটু নিরিবিলি চা খেতে এলাম আর অমনি মাথার ওপরে চীন-জাপানের যুদ্ধ বেধে গেল—পোড়া বরাত এমনি—

একজন ফিরিওয়াল্লা এসে শামিয়ানার বাইরে দাঁড়িয়ে বন্ধে—মোমের ফুল—খুব চমৎকার মোমের ফুল—গোলাপ, ক্রিসেন্থিমাম, গাঁদা—ভারী সস্তা মোমের ফুল—

এমন সময় একজন খবরের কাগজওয়াল্লা ‘সাংহাই ডেলি নিউজ্’ বলে হেঁকে যাচ্ছে দেখে বিমল ডেকে একখানা কাগজ কিনলে। এ কাগজের একদিকে চীনা ভাষা ও অন্য দিকে ইংরাজি ভাষায় লেখা খবর—চীনাদের পরিচালিত।

রাস্তায় লোক ভিড় করে কাগজ কিনছে, কাগজ এইমাত্র বেরিয়েছে, এ বেলার যুদ্ধের খবর নিয়ে—সবাই যুদ্ধের খবর জানতে চায়।

এ্যালিস্ বন্ধে—যুদ্ধের খবর কি?

তারপর সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা পড়ে দেখতে লাগলো। শেনসু প্রাচীরের কাছে জাপানী সৈন্য চীনাদের কাছে ধাক্কা খেয়ে হটে গিয়েছে। জাপানীদের বহু সৈন্য মারা পড়েছে।

সুরেশ্বর বন্ধে—সর্ব্বের মিত্যা। জাপানীরা জিতছে। ভুলখবর দিচ্ছে আমাদের, পাছে শহরে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দেখছো না বোমা ফেলবার কাণ্ড? চীনারা জিতছে! ফুঃ—

ওদের অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হোল, মাত্র তিন মাইল দূরে শেনসু প্রাচীরের কাছে যুদ্ধ চলছে, অথচ ওদের খবরের কাগজ পড়ে জানতে হচ্ছে যুদ্ধের ফলাফল, যেমন কলকাতায় বসে বা আমেরিকায় বসে লোক জেনে থাকে। তিন মাইল দূরে থেকেও বোঝবার কোনো উপায় নেই যুদ্ধের আসল খবরটা কি? চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সংবাদ পাঠাচ্ছে সেই সংবাদই ছাপা হচ্ছে। এই রকমই হয় সর্ব্বত্রই, অথচ খবরের কাগজের পাঠকেরা তা জেনেও জানে না। খবরের কাগজে লিখিত সংবাদ বাইবেল বা পুরাণের মতো অভ্রান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয়, এইটেই আশ্চর্য্য। এ সম্বন্ধে ওদের অভিজ্ঞতা আরও পরে যা হয়েছিল তা আরও অদ্ভুত।

কাগজের এক কোণে একটি সংবাদের দিকে মিনি ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে। মার্শাল চিয়াং কৈ শাক্ চা-পেই পল্লীর বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসবেন রাত ন’টার সময়ে।

মিনি হাতঘড়ি দেখে বন্ধে—এখন পৌনে ন’টা।

বিমল বন্ধে—তা হোলে হাসপাতালেও যাবেন, চল আমরা হাসপাতালে ফিরি। মার্শাল চিয়াংকে কখনও দেখি নি, দেখা যাবে এখন।

এমন সময়ে ওদের সামনে রাস্তায় একটা হে-চৈ উঠলো। রাস্তার দুধারে লোকজন সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চীনা পুলিশম্যান রাস্তার মাঝখানের লোক হটিয়ে দিলে। এক মিনিটের মধ্যে পর পর ছ’খানা মোটরকার দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। রাস্তার জনতা চীনাভাষায় চীৎকার করে বলে উঠলো—‘মহাচীনের জয়! মার্শাল চিয়াং-এর জয়! টেঙ্ক্ রুট আর্মির জয়!’

এ্যালিস্ বন্ধে—এই মার্শাল চিয়াং গেলেন!

বিমল বন্ধে—তবে আর হাসপাতালে এখন ফিরে কি হবে? চল কন্সেশনে ফিরি। রাত হয়েছে, এ অঞ্চলে এখন রাতে বেড়ানোর পক্ষে নিরাপদ নয়। জাপানী বোমা তো আছেই, তা ছাড়া তার চেয়েও খারাপ চীনা দস্যুদের উপদ্রব। সঙ্গে মেয়েরা—

সুরেশ্বর বন্ধে—তা ছাড়া ঘুমুতেও তো হবে। কাল সকাল থেকে আবার ডিউটি—

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

কন্সেশনে ফিরবার পথে ওদের এক বিপদ ঘটলো।

কন্সেশনে ফিরবার পথে ওরা চ্যাং সো এ্যাভিনিউ দিয়ে খানিকটা এসে পড়লো একটা জনবহুল পাড়াতে। সেখানে দু'খানা রিক্শা ভাড়া করে ওরা তাদের কন্সেশনে যেতে বন্ধে। তারপর ওরা গল্প ও গুজবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—যখন ওরা আবার রাস্তার দিকে নজর করলে তখন দেখলে রিক্শা একটা নির্জন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। দুধারে দরিদ্র লোকদের কাঁচা মাটির খাপ্রা-ছাওয়া ঘর। রাস্তা জনশূন্য—দূরে দূরে খোলা মাঠের মধ্যে কি যেন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে।

বিমল বন্ধে—এ কোথায় নিয়ে এসে ফেলে হে?

সুরেশ্বর পিজিন্ ইংলিশে একজন রিক্শাওয়ালাকে বন্ধে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছি স্ রে? এ পথ তো নয়?

রিক্শাওয়ালা কোনো উত্তর না দিয়েই জোরে ছুটে লাগলো।

বিমলের মনে সন্দেহ হলো। সে বন্ধে—এর মনে কোনো বদমাইশি মতলব আছে মনে হচ্ছে। আমরা তো একেবারে নিরস্ত্র। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে—

মিনি ও এ্যালিস্ তখন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। ওরাও বন্ধে—আর গিয়ে দরকার নেই—চীনা গুণ্ডা এই সময় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। নামো এখানে সব।

দুখানা রিক্শাই পাশাপাশি যাচ্ছিল। এবার মিনিদের রিক্শাখানা এগিয়ে গেল এবং বিমল কিছু বলবার পূর্বেই রিক্শাখানা হঠাৎ পথের মোড় ঘুরে পাশের একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বিমলদের রিক্শাখানা কিন্তু তখন সোজা রাস্তা বেয়েই দ্রুত চলেছে। বিমলের ও সুরেশ্বরের চীৎকারে সে আদৌ কর্ণপাত করলে না।

বিমল লাফ দিয়ে রিক্শাওয়ালার ঘাড়ে পড়লো রিক্শা থেকে। রিক্শাখানা উল্টে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সুরেশ্বর রিক্শার সঙ্গে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। রিক্শাওয়ালারা সেখানে বসে পড়লো—ওর ওপর বিমল!

রিক্শাওয়ালারা একটু পরেই গা ঝেড়ে উঠে চীনা ভাষায় কি একটা দুর্বোধ্য কথা বলে উঠে ওদের দিকে এগিয়ে এল।

বিমল চেষ্টা করে বলে উঠলো—সুরেশ্বর, সাবধান!

রিক্শাওয়ালার হাতে একখানা বড় চক্চকে ছোরা দেখা গেল।

সুরেশ্বর পেছন থেকে তাকে জোরে এক ধাক্কা লাগালে। সে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আবার বিমলেরই উপর। বিমলের সঙ্গে তার ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হোল। বিমলের রীতিমতো শরীরচর্চা করা স্বাস্থ্য ছিল। মিনিট পাঁচছয়ের মধ্যে রিক্শাওয়ালাকে মাটিতে ফেলে বিমল তার হাত মুচড়ে ছোরাখানা টান দিয়ে ফেলে বন্ধে—ওখানা তুলে নাও সুরেশ্বর—তারপর এই বদমাইশটার গলায় বসিয়ে দাও—

ছোরা হাত থেকে খসে যাওয়াতে বদমাইশটা নিরুৎসাহ ও ভীত হয়ে পড়লো—এইবার ছোরা বসানোর কথা শুনে, সে বিমলের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলে। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল পাঁচ ছ'মিনিটের মধ্যে।

বিমল ঝেড়ে উঠে একটু দম নিয়ে বন্ধে—সুরেশ্বর, মেয়েদের গাড়ীখানা!

তারপর ওরা দুজনেই ছুটলো সেই গলিটার দিকে—যেটার মধ্যে মিনিদের রিক্শাখানা ঢুকেছে। গলিটা নিতান্ত নোংরা, দুধারে কাঁচা টালির ছাদওয়ালো নীচু নীচু বাড়ী—কিছু দূরে একটা সাধারণ স্নানাগার—এখানে

নীচশ্রেণীর মেয়ে পুরুষে সাধারণতঃ স্নান করে না—করলেও রাত্রে করে। স্নানাগারের সামনে দু-জন চীনেম্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিমল তাদের পিজিন ইংলিশে জিজ্ঞেস করলে—একখানা রিক্শা কোন্ দিকে গেল দেখেছ?

তাদের মধ্যে একজন বলে—ওই বাড়ীটার সামনে একখানা রিক্শা দাঁড়িয়েছিল একটু আগে।

বিমল ও সুরেশ্বর বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বিমল বলে—চল বাড়ীর মধ্যে ঢুকি—

ঘরটায় ঢুকেই ওদের মনে হোল, এটা একটা চপ্পুর আড্ডা। ঘরের মধ্যে চার পাঁচটা চীনাবাঁশের চেয়ার, একদিকে একটি নীচু বাঁশের তক্তপোশ। চপ্পু খাবার লম্বা নল, ছিটেগুলি গালার বড় পাত্রে, চপ্পুর আড্ডার সব জিনিসই মজুদ। দেওয়ালে চীনা দেবতার ভীষণ প্রতিকৃতি। ঘরটি লোকশূন্য, নির্জন। এ ধরনের চপ্পুর আড্ডা ওরা সিঙ্গাপুরে দেখেছে। কিন্তু বাড়ীর লোকজন কোথায়? বিমল ও সুরেশ্বর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

একটা বড় ঘরের মধ্যে অনেকগুলো লোক বসে মা জং খেলছে। বিমল বুঝতে পারলে, জায়গাটা শুধু চপ্পু নয়, নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীদের আড্ডাও বটে। ওদের দেখে দুজন লোক উঠে দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে একজন কর্কশ কণ্ঠে পিজিন ইংলিশে বলে—কি চাই? কে তোমরা?

বিমলের মাথায় চটকরে এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে কর্তৃত্বের গ্রামভারী চালে বলে—আমরা ব্রিটিশ কনসেশনের পুলিশের লোক। আমাদের সঙ্গে দশজন কনস্টেবল গিলির মোড়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ও রিভলবার আছে। দুজন মেমসাহেবকে এই আড্ডায় গুম করা। হয়েছে—বার করে দাও, নইলে আমরা জোর করে ভেতরে ঢুকে সন্ধান করবো। দরকার হোলে গুলি চালাবো।

এবার একজন প্রৌঢ় লম্বা ধরনের লোক এককোণ থেকে বলে উঠলো—আমরা কনসেশনের পুলিশ মানি নে—সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের সহি করা ওয়ারেন্ট দেখাও—

বিমল বলে—তুমি জানো এটা যুদ্ধের সময়! আমরা জোর করে ঢুকবো এবং দরকার হোলে এই মা জং-এর জুয়ার আড্ডার প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে সাংহাই পুলিশের হাতে দেবো—এর জন্যে যদি কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় পুলিশ মার্শালের কাছে আমরা দেবো—তুমি মেম সাহেবদের বার করে দেবে কিনা বলো—

লোকটা বলে—কোন মেমসাহেবের কথা বলছো? মেমসাহেবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? আমি ভাবছিলাম, তুমি জুয়া আর চপ্পুর আড্ডা হিসেবে বাড়ী সার্চ করবে বলছো!

বিমল বলে—বেশী কথায় সময় নষ্ট করতে চাইনে—তাহলে আমাদের জোর করতে হোল—সুরেশ্বর কনস্টেবলদের ডাকো—

হঠাৎ চীৎকার করে সে বলে উঠলো—মাথা নীচু করে বসে পড়—বসে পড় সুরেশ!

সাঁ করে একটা শব্দ হোল এবং ঝকঝকে কি একটা জিনিস ওদের চোখের সামনে এক ঝলক খেলে গেল—ওরা তখন দুজনেই বসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেছনে দেওয়ালের একটা ভারি জিনিসে ঠক করে লাগবার শব্দ হোল!

সুরেশ্বর পিছন ফিরে চকিতে চেয়ে দেখলে—একখানা বাঁকা ধারালো চক্চকে চীনে ছোরা, ছুঁড়ে-মারা ছোরা, ছুঁড়ে মারবার জন্যেই এগুলি ব্যবহৃত হয়—ছোরাখানা সবগে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে, আধখানা ফলাসুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে গেঁথে গিয়েছে।

সুরেশ্বর শিউরে উঠলো—ওরই গলা লক্ষ্য করে ছোরাখানা ছোঁড়া হয়েছিল।

ওদের সঙ্গে সত্যিই হাতাহাতি বাধলে বা সবাই একযোগে আক্রমণ করলে, নিরস্ত্র বিমল ও সুরেশ্বর কি দশা হোত বলা যায় না, কিন্তু বিমল মাটি থেকে উঠেই দেখলে ঘরের মধ্যে আর একজন লোকও নেই।

পালায় নি—হয়তো বা ওরা লোক ডাকতে গিয়েছে। সুরেশ্বর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে খানিকটা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। বিমল গিয়ে তার হাত ধরে টেনে তুলে বলে—সুরেশ্বর, এই বেলা উঠে বাড়ীটা খুঁজি এসো—এখনি সব চলে আসতে পারে। একটা ঘর বন্ধ ছিল—বাইরে থেকে তালা দেওয়া। আর সব ঘর খোলা—সেগুলি জনশূন্য। সুরেশ্বর ও বিমল দুজনেই একযোগে ঘরের দরজায় লাথি মারতে লাগলো।

—মিনি-মিনি-এ্যালিস্—এ্যালিস্—

ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বিমল বজ্জে—কি ব্যাপার! ঘরের মধ্যে কেউ নেই নাকি?

দুজনের সম্মিলিত লাথির ধাক্কাতে দরজার কিছুই হোল না। বেজায় মজবুত সেগুন কাঠের দরজা। হঠাৎ বিমলের চোখে ধরা পড়লো ঘরের দেওয়ালের ওপরের দিকে। সেখানে একটা ছোট ঘুলঘুলি রয়েছে। কিন্তু অত উঁচুতে ওঠা এক মহা সমস্যা। বিমল খুঁজতে খুঁজতে একটা জলের টব আবিষ্কার করলে। সেটা উপুড় করে পেতে, মা জং খেলার ঘর থেকে বাঁশের চেয়ার এনে, তার ওপর চাপিয়ে উচু করে বিমল তার ওপর অতিকষ্টে উঠলো। সার্কাসের খেলোয়াড় না হোলে ও ভাবে ওঠা এবং নিজেকে ঠিকমতো দাঁড় করিয়ে রাখা অতীব কঠিন ব্যাপার।

সুরেশ্বর টবটা ধরে রইল—বিমল সন্তর্পণে উঠে ঘুলঘুলির কাছে মুখ নিয়ে গেল। নীচে থেকে সুরেশ্বর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলে—কি দেখছ? কেউ আছে?

—ঘোর অন্ধকার—কিছু তো চোখে পড়ছে না!

—ওদের পরনে নার্সের সাদা পোশাক আছে, অন্ধকারেও তো খানিকটা ধরা যাবে—ভাল করে দেখ—

বিমল ভাল করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে বলে—উঁহু, কিছুই তো তেমন দেখছি—সাদা তো কিছুই নেই—সব কালোয় কালো। আমার মনে হচ্ছে ঘরটায় কিছুই নেই—

—উপায়?

—দাঁড়াও আগে নামি। উপায় ভাবতে হবে, তার আগে দরজা ভেঙে ফেলতে হবে যে করেই হোক।

নীচে নেমে বিমল গম্ভীর মুখে বজ্জে—সুরেশ্বর মিনি বা এ্যালিস্কে এ ভাবে হারিয়ে আমরা কন্সেশনে ফিরে যেতে পারবো না। দরকার হোলে এজন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ—খুঁজে তাদের বার করতেই হবে। তবে তারা যে এই বাড়ীতেই বা এই ঘরেই আছে তারও তো কোনো প্রমাণ আমরা পাই নি। তবুও এই ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরটা না দেখে আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাবো না। তুমি এক কাজ কর। আমি এখানে থাকি—তুমি বাইরে যাও, চীনা পুলিশকে খবর দাও। তাদের বলো কন্সেশনে টেলিফোন করতে। দরকার হোলে কন্সেশনের পুলিশ আসুক। আজ রাতের মধ্যেই তাদের খুঁজে বার করতেই হবে—নইলে তাদের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। তুমি দেরি করো না, চট করে বাইরে চলে যাও।

সুরেশ্বর বজ্জে—তোমাকে একা ফেলে যাবো? ওরা যদি দল পাকিয়ে আসে? তুমি নিরস্ত্র।

—সেজন্যে ভেবো না। মিনি ও এ্যালিস্ তার চেয়েও অসহায়। সকলের আগে ওদের কথা ভাবতে হবে আমাদের।

সুরেশ্বর চলে গেল।

বিমল একা বাড়ীটাতে। উত্তেজনায় প্রথম মুহূর্ত কেটে গেলে বিমল এইবার ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে। মিনি আর এ্যালিস্ নেই। গুণ্ডারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওর মনে হোল, কন্সেশনের ডাক্তার বেডফোর্ড বলেছিলেন—চীনা-সাংহাইতে মধ্য-এশিয়ার বর্ধরতার সঙ্গে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা মিলছে। এখানে কন্সেশনের বাইরে মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়। বিশেষ করে এই যুদ্ধ দুর্দিনের সময়ে, দেশে আইন নেই, পুলিশ নেই—প্রত্যেক সবল মানুষ নিজেই পুলিশ। সাবধানে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

কি ভুলই করেছে অত রাতে অজানা রাস্তায় অজানা চীনে রিক্শাওয়ালার গাড়ীতে চড়ে,—সঙ্গে যখন মেয়েরা রয়েছে! তার চেয়েও ভুল, সঙ্গে রিভলবার নিয়ে না বেরুনো।

এখন উপায় কি? যদি ওদের সন্ধান না-ই মেলে? কন্সেশনে সে আর সুরেশ্বর মুখ দেখাবে কেমন করে?

স্ক্রু নির্জন বাড়ীটা। সাড়াশব্দ নেই কোনো দিকে। মা জং খেলার ঘরে একটা চীনে লণ্ঠন ঝুলছে। আধ আলো অন্ধকারে বিকট মূর্তি চীনা দেবতার ছবিটা যেন এক হিংস্র দৈত্যের প্রতিকৃতির মতো দেখাচ্ছে—সেই একমাত্র আলো সারা বাড়ীটাতে। বাকীটা অন্ধকার। আশ্চর্য্য, কোথায় কলকাতা শাঁখারিটোলা লেন, আর কোথায় সাংহাই-এর এক নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীর আড্ডা! অবস্থার ফেরে কোথা থেকে মানুষকে কোথায় নিয়ে এসে ফেলে!

এ্যালিস্ চমৎকার মেয়ে, মিনিও চমৎকার মেয়ে; ওদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হোলে সে নিজেকে ক্ষমা করবে না। ওদের জন্যে বিমলই দায়ী। হাসপাতাল থেকে বার হয়ে কনসেশনে ফেরা উচিত ছিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে গিয়েছে। সুরেশ্বরের দেখা নেই। সে কি কনসেশনে ফিরে গিয়েছে নিজেই খবর দিতে?

বিমল আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটলো। রাস্তার আলো হঠাৎ যেন নিবে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এ আবার কি কাণ্ড!

মিনিট পাঁচ ছয় কি দশ পরে বাইরে থেকে একজন উত্তেজিত গলায় চীনা ভাষায় কি বললে—কোনো সাড়া না পেয়ে আবার বন্ধে, ঠিক যেন কাউকে ডাকছে।

বিমল অবাক হয়ে ভাবছে গুণ্ডারা এল নাকি!

হঠাৎ দুজন চীনা ইউনিফর্ম পরা পুলিশম্যান বাড়ীর মধ্যে খানিকটা ঢুকে রাগের ও গালাগালির সুরে চেষ্টা করে কি কথা বলে উঠলো।

বিমল ভাবলে সুরেশ্বরের অনীত পুলিশম্যান বাড়ী খুঁজতে এসেছে। ও এগিয়ে যেতে পুলিশম্যান দুজন একটু আশ্চর্য হোল। তারপর পিজিন ইংলিশে উত্তেজিত কণ্ঠে মা জং খেলার ঘরের আলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বন্ধে—আলো এখুনি নিবোও। আমাদের বাঁশি শুনতে পাওনি। আলো জ্বলে রেখেছ কেন?

বিমল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বন্ধে—আলো জ্বলে রেখেছি কেন?

—হ্যাঁ, আলো জ্বালিয়ে রেখেছ কেন? আলো, আলো লণ্ঠন—যা থেকে আলো বার হয়, অন্ধকার দূর করে সেই আলো—

—আমি তো জ্বলে রাখি নি। এ আমার বাড়ী নয়।

চীনা পুলিশম্যান দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। এ বাড়ীর যে এ লোক নয়, তারা সেকথা আগেই বুঝেছিল।

বিমল এতক্ষণে যেন সন্নিহিত ফিরে পেল। বন্ধে—দাঁড়াও, তোমরা যেও না। প্রথমে বলো আলো নিবিয়ে দেবো কেন?

—মিস্টার, সাংহাই পুলিশ-মার্শালের নোটিশ দেখো নি?রাত এগারোটীর পরে শহরের সব আলো নিবিয়ে দিতে হবে। ব্ল্যাক আউট। বোমা ফেলেছে জাপানীরা। তোমার কি বাড়ী?

—আমার এ বাড়ী নয়। সব বলছি, আমি কনসেশনের লোক—যুদ্ধের ডাক্তার। ভারতবর্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। আমরা চারজনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই পথে রিক্শা করে যাচ্ছিলুম—সঙ্গে ছিলেন দুটি মার্কিন মহিলা। রিক্শাওয়ালা তাঁদের নিয়ে কোথায় পালিয়েছে। আমাদের রিক্শা অন্যপথে নিয়ে গেলে আমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে সন্ধান পাই এই বাড়ীটার সামনে রিক্শটা মেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা বাড়ীতে ঢুকে দেখি, এটা মা জং জুয়াড়ীদেরও চণ্ডুর আড্ডা। ওদের সঙ্গে মারামারি হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কোথায় পালিয়েছে। আমার বন্ধু পুলিশ ডাকতে গিয়েছে। তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে, এই তালাবন্ধ ঘরটা খোলো—আমার বিশ্বাস এরই মধ্যে মহিলা দুটিকে আটকে রেখেছে।

পুলিশম্যান দুজন আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। তারা যে বেজায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, মা জং খেলার ঘরে চীনে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয়ও ওদের মুখ দেখে বিমলের সেটা বুঝতে দেরি হোল না। যেন ওরা কখনো ওদের ক্ষুদ্র পুলিশ জীবনে এমন একটা আজগুবি ব্যাপারের সম্মুখীন হয় নি—ভাবখানা এই রকম।

একজন পুলিশ চৌকীদার এগিয়ে বন্ধ ঘরের তালাবন্ধ দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে বন্ধে এই ঘর? কই, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?

—না, সাড়া দেবে কে? ধরো অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছে!

পুলিশম্যান দুটির মধ্যে একজন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের মতো অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলে—না, আমার তা মনে হয় না মিস্টার। তুমি জানো না এই সব জুয়াড়ী ও চণ্ডুর আড্ডাধারী বদমাইশদের। এ ঘরে ওদের রাখে নি। ওদের গায়ে গহনা ছিল?

—একজনের গলায় একটা বুটো মুক্তোর মালা ছিল—দুজনের হাতে দুটো সোনার হাতঘড়ি আর সোনার পাতলা বালা—

এমন সময় বাইরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বাড়ীতে ঢুকলো—আগে আগে সুরেশ্বর, পেছনে একদল চীনা পুলিশ সঙ্গে একজন কনসেশন পুলিশ।

সুরেশ্বর ঢুকেই বলে—টেলিফোন করে দিয়েছি কনসেশনে—পুলিশ মার্শালকে জানানো হয়েছে। এই একজন কনসেশনের পুলিশম্যানকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে আনলুম। এদিকে মহা মুশকিল, শহরের ব্ল্যাক-আউট, আলো জ্বালবার জো নেই—সব ঘটঘুটে অন্ধকার।

—ভাঙো দরজা, সবাই মিলে।

সকলের সমবেত চেষ্টায় ও ধাক্কায় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়লো।

বিমল সকলের আগে ঘরে ঢুকলে। পেছনে ছ’টা পুলিশ টর্চ জ্বলে ঢুকলো। তিনটি বড় বড় জালা ছাড়া ঘরে কিছু নেই। মানুষের চিহ্ন তো নেই-ই।

একজন পুলিশ উঁকি মেরে জালার মধ্যে দেখলে। জালাতে মানুষ তো দূরের কথা, একবিন্দু জল পর্য্যন্ত নেই। খালি জালা।

মাথার ওপর আকাশে আবার অনেকগুলো এরোপ্লেনের ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা গেল। দুজন পুলিশম্যান উঠোনে গিয়ে হেঁকে বলে—আলো নিবিয়ো দাও, নিবিয়ো দাও, জাপানী বম্বার—

সুরেশ্বর বলে—আরে এরা বেশ তো! সারা সন্ধ্যাবেলা জাপানীরা বোমা ফেলে তখন ব্ল্যাক-আউট করলে না—আর-এখন এদের হুঁশ হোল—

বিমল উপরের দিকে মুখ তুলে বললে—হাঁ, জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার। মিনি চিনিয়ে দিয়েছিল কনসেশনে—মনে আছে?

সমস্ত সাংহাই শহর অন্ধকার। সেই আধো আলো আধে অন্ধকারের মধ্যে—কারণ নক্ষত্রের আলো সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের আদেশ মানে নি—জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, তাও সব সময় নয়। মাঝে মাঝে যেন সেগুলো কোন্ দিকে চলে যায়, আবার খানিক পরে মাথার ওপরে আসে।

বিমল ভাবছিল, জাপানী বম্বার থেকে আর বোমা ফেলছে না তো!

সুরেশ্বরকে কথাটা বলতে সে বলে—ব্ল্যাক আউটের জন্যে নিশ্চয়। সবাই লুকিয়েছে, রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। কোনো দিকে কোনো শব্দ আছে?

দুজন চীনা পুলিশ বলে—তোমরা বোঝ নি মাস্টার। ওরা বোমা ফেলবে না, এখন সুবিধে খুঁজছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার। সেই বোমা ফেলে লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে, যেমন সব ভয়ে রাস্তাঘাটে বেরুবে কি পালাতে যাবে, অমনি গ্যাসের বোমা ফেলবে। এখন গ্যাসের বোমা ফেলে তো মানুষ মরবে না, কারণ সব ঘরের মধ্যে জানালা দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে ওদের আগে বার করবে রাস্তায়—পরে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বোমা ছাড়বে, এ-ই করে আসছে দেখছি আজ ক’দিন থেকে—

একটু পরে কনসেশনের পুলিশ এল, চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল স্বয়ং এলেন বহু লোকজন নিয়ে। ওদের দিয়ে চণ্ডুর ও জুয়াড়ীদের আড্ডার ছোট্ট উঠোনটা ভরে গেল।

ডেপুটি মার্শাল বলেন—শহরে ব্ল্যাক আউট, ঘটঘুটে অন্ধকার চারিধারে—এক্ষুনি জাপানীরা হাই এক্সপ্লোসিভ বম্ব ফেলবে, তারপরে ফসপেন্ গ্যাসের বোমায় বিষ ছাড়বে। এ অবস্থায় কি করা যায়? মেয়ে দুটিকে কোথায় আটকে রেখেছে, কি করে খুঁজি?

কনসেশন পুলিশের কর্মচারীরা বল্লেন—আপনার এলাকায় যত বদমাইশের আড্ডা আছে, সব হানা দিই চলুন।

—কিন্তু তাতে সময় নেবে। এখুনি যে সব ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে ছুটে বেরিয়ে পড়বে। দেখছেন না ওপরকার অবস্থা? ওদের প্ল্যান ঠিক করে নিতে যা দেরি! আচ্ছা, দেখি কতদূর কি হয়। মেয়ে দুটিকে গুণ্ডারা আটকে রেখেছে, মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাদের প্রাণের ভয় বর্তমানে নেই, একথা ঠিকই। সাংহাইতে এ রকম অনবরত হচ্ছে। এই ভদ্রলোক দুটি এত রাতে মেয়েদের নিয়ে চা-পেই পল্লীতে বেরিয়ে বড় বিবেচনার অভাব দেখিয়েছেন। যত গুণ্ডা আর বদমাইশের আড্ডা এই পাড়ায়।

পুলিশের লিস্ট দেখে কাছাকাছি দুটি বদমাইশের আড্ডায় হানা দেওয়া হোল—কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিললো না।

তারপর—রাত যখন দেড়টা—এমন এক ভীষণ ব্যাপারের সূত্রপাত হয়ে গেল যে, এর আগে যে সব বোমা ফেলার কাণ্ড সুরেশ্বর ও বিমল দেখেছে—এর কাছে সেগুলো সব একেবারে ম্লান হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল।

বিমল আর সুরেশ্বরের মনে হোল, আকাশ থেকে চারিধারে একসঙ্গে যেন দেবরাজ ইন্ডের বজ্র পড়তে শুরু হয়েছে—অসংখ্য। অনেক, অনেক—গুনে শেষ করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে বিষম বিস্ফোরণের আওয়াজ, ইট টালি ছোট্টার শব্দ, দেওয়াল পড়ার ছাদ পড়ার শব্দ—মানুষের কলরব, হৈ-চৈ, কান্না, পুলিশের হুইসল, মাথার ওপর ঘর্ষের শব্দ—সবসুদ্ধ মিলিয়ে একটা সুগুণ্ড দৈত্যপূরীর দৈত্যরা যেন হঠাৎ জেগে উঠে উন্মাদ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে!

ডেপুটি মার্শাল অর্ডার দিলেন, সব কনস্টেবল একত্র হয়ে গেল। কনসেশন পুলিশের কর্মচারীরা সাহায্য করতে চাইলে হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেই অন্ধকারের মধ্যে টর্চ জ্বলে অট্টালিকার ভগ্নস্তুপ অনুসন্ধান করে আহত ও চাপা-পড়া মানুষের সন্ধান চলতে লাগলো। কাজ এগোয় না। ভাঙা বাড়ীর ইটের রাশি পদে পদে ওদের বাধা দিতে লাগলো। একটা চীনা মন্দিরের কাছে চারজন লোক মরে পড়ে আছে। দুটি ছোট বাড়ী চুরমার হয়ে সেখানে এমন ভাবে রাস্তা আটকেছে যে মৃতদেহগুলো টেনে বার করবার উপায়ও রাখেনি। ইটের স্তুপের ওপর উঠে আবার ওদিক দিয়ে নেমে যেতে হোল—তবে জায়গাটা পার হওয়া সম্ভব হোল।

বিমল চেষ্টা করে বলে উঠলো—সামনে প্রকাণ্ড বোমার গর্ত, সাবধান!

সবাই চেয়ে দেখলে আন্দাজ ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত একটা প্রকাণ্ড গহ্বর থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে—এবং গর্তের ধারে এখনও ছটকানো ধাতুর খোলা-ভাঙা টুকরো পড়ে আছে, বিমল টুকরোটা হাতে তুলে নিয়েই ফেলে দিলে—গরম আগুন!

কর্ডাইটের উগ্র গন্ধ জায়গাটায়। ওরা সবাই অবাক হয়ে সেই ভীষণ গর্তটার দিকে চেয়েই রইল।

এমন সময়ে দেখা গেল, ছ'খানা জাপানী প্লেন সারবন্দী হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে আসছে—ওদের মাথার উপর। বোধ হয় ওদের টর্চের আলো দেখেই আসছে। চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল হেঁকে বল্লেন—সাবধান! বোমার গর্তে লাফ দাও!

সবাই বুঝলে এ অবস্থায় ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত এবং আন্দাজ প্রায় পনেরো ফুট গভীর বোমার গর্তটাই সব চেয়ে নিরাপদ স্থান, সারা চা-পেই পল্লী অঞ্চলের মধ্যে।

ঝুপঝুপ! দু সেকেন্ডের মধ্যে ওপরে আর কেউ নেই—সবাই গর্তটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিমলও ওদের সঙ্গে লাফ দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁটু পর্যন্ত পাক পুঁতে গেল, গর্তটার মধ্যে কাদা আর জল—কাদার সঙ্গে বোমার ভাঙা টুকরো মেশানো—সবাই কোনো রকমে জল কাদার মধ্যে মাথা গুঁজে রইল ধার ঘেঁষে—কারণ মাঝখানে থাকলে অনেকখানি নক্ষত্র-খচিত অন্ধকার আকাশ দেখা যায়—তখন আর নিজেকে খুব নিরাপদ বলে মনে হয় না।

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকান পুলিশম্যান ওদের বোঝাচ্ছিল যে, এ অবস্থায় কোনো এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেললে ওদের লাগবার কথা নয়—সে নাকি মাধুকুও রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানে—বোমার গর্তই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

আর একজন বল্লেন—কেন, যদি মেশিনগান চালায়?

আগের লোকটা বন্ধে—ফুঃ! মেশিনগান! এই অন্ধকারে!

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল সেই ছ'খানা প্লেন ঠিক ওদের গর্তের ওপর এসে চক্রাকারে উড়ছে এবং ক্রমে নীচু হয়ে নামছে যেন।

কে একজন বন্ধে—আমাদের টের পেলে নাকি!

মুখের কথা সবারই ওষ্ঠাগ্রে যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে—বুকের রক্ত পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেল সকলের। কেবল আগের পুলিশম্যানটি বলতে লাগলো—কোনো ভয় নেই—ওরা মেশিনগান ছুঁড়ে কিছু করতে পারবে না—কাওয়াসাকি বম্বারের মেশিনগানের তরিবৎ সুবিধের নয়—হাত যদি জার্মান হেঙ্কেল ফিফ্টিওয়ান্, কি স্কুলজ্-ব্যাঙ্ক একশো এগারো—

সবাই চাপা গলায় বিষম রাগেরসঙ্গে একসঙ্গে বলে উঠলো—আঃ চুপ! সঙ্গে সঙ্গে প্লেনগুলো অনেকখানি নেমে এল এবং অকস্মাৎ এক তীব্র সার্চলাইটের আলোয় ওদের বোমার গর্ত এবং চারি-পাশের আরও অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো—ওঁবার সঙ্গে সঙ্গে পটকা বাজির মতো মেশিনগান ছোঁড়ার শব্দে ওদের কানে তালা ধরবার উপক্রম হলো।

একজন ফিস্‌ফিস্ করে বন্ধে—যদি বাঁচতে চাও তো সবাই মড়ার মতো পড়ে থাকো—ভান করো যে সবাই মরে গিয়েছে—

আগের সেই মার্কিন পুলিশম্যানটি যুক্তিতর্কে অদম্য। সে বলে উঠলো—কিছু হবে না দেখো—হাঁ হাত, যদি হেঙ্কেল ফিফ্টি ওয়ান্—কিংবা—

—আবার!

সেই কাদাজলের মধ্যে হাত পা গুটিয়ে উপুড় হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে বিমল অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো কথা ভাবছিল না। তার চিন্তা শুধু বর্তমানকে আশ্রয় করে। সংসার নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ—শুধু সে আছে, আর আছে এই দুর্দর্ষ, বিভীষণ, নিষ্ঠুর বর্তমান। যে কোনো মুহূর্তে মেশিনগানের গুলি ওর জীবলীলা, ওর সমস্ত চৈতন্যের অবসান করে দিতে পারে, সারা দুনিয়া ওর কাছ থেকে মুছে যেতে পারে এক মুহূর্তে—যে কোনো মুহূর্তে। কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে, চোখ বুজে ও পড়ে রইল—ওর পাশে সবাই সেই ভাবেই আছে—বীরত্ব দেখাবার অবকাশ নেই, বাহুবল বা সাহস দেখাবার অবসর নেই—খোঁয়াড়ের শুয়োরের দলের মতো ভয়ে কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকা—এর নাম বর্তমান যুগের যুদ্ধ! ওরা আজ দেশপ্রেমিক বীর সৈনিক দল হোলেও এর বেশী কিছু করতে পারতো না—এই একই উপায় অবলম্বন করতেই হাত—অন্য গতান্তর ছিল না। অন্য কিছু করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কানের এত কাছে এরোপ্লেনের শব্দ বিমল কখনও পায়নি, এরোপ্লেনের বিরাট আওয়াজ কানে একেবারে তালা ধরালো যে! ওর ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে চোখ চেয়ে দেখে, এরোপ্লেনগুলো গর্তটার কত ওপরে এসেছে।

আওয়াজ—আওয়াজ—এরোপ্লেনের আওয়াজ, মেশিনগানের আওয়াজ! কিন্তু আওয়াজ যত হোলো, কাজ ততো হলো না। মেশিনগানের একটা গুলিও বোমার গর্তের মধ্যে পড়লো না। দু-তিনবার প্লেনগুলো গর্তের দিকে নেমে এল পুরো দমে, কিন্তু কিছু করতে পারলেনা। আওয়াজ, কেবলই আওয়াজ। ক্রমে প্লেনগুলো সরে গেল গর্তের ওপর থেকে, হয়তো দেখে ভাবলে গর্তের লোকগুলো সব মরে গিয়েছে। মড়ার ওপর মেশিনগানের দামী গুলি চালিয়ে বৃথা অপব্যয় করা কেন?

ওরা সবাই গর্ত থেকে উঠে এল। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলে, কি অদ্ভুত কাদামাখা চেহারা হয়েছে সকলকার! পুলিশের স্মার্ট ইউনিফর্ম একেবারে কাদায় আর ঘোলা জলে নষ্ট হয়ে ভিজে-কাঁথা হয়ে গিয়েছে। মার্কিন পুলিশম্যানটি গর্ত থেকে ঠেলে উঠেই বন্ধে—বলি নি তোমাদের, এরা মেশিনগান ছুঁড়ে সুবিধে করতে পারে না ও এরোপ্লেন থেকে? স্কুল্ ব্যাঙ্ক্ একশো এগারো যদি হাত, তবে দেখতে একটা প্রাণীও আজ বাঁচতাম না।

মিনিট পনেরো কেটে গেল। বোমার প্লেনগুলো আকাশের অন্যদিকে চলে গিয়েছে। কি ভীষণ আওয়াজ! বিমলের মনে পড়লো, এ্যালিস্ তার নরম সাদা হাত দুটি তুলে কান ঢেকে বলতো—হোয়াট্-এ্যান-অ-ফুল্ রকেট! এ্যালিসের সেই ভঙ্গিটা, তার মুখের কথা মনে পড়তেই বিমলের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো।

এ্যালিস্—মিনি—বেচারী এ্যালিস্!—কি ভীষণ কাল-রাত্রি আজ ওদের পক্ষে! সাংহাইয়ের এই দুর্যোগের রাত্রির কথা বিমল কি কখনো ভুলবে জীবনে? কোথায় সে সিঙ্গাপুরে ডাক্তারী করবে বলে বাড়ী থেকে রওনা হোল—অদৃষ্ট তাকে কোথায় কি অবস্থায় নিয়ে এনে ফেলেছে!

হঠাৎ পিনাংএর মন্দিরে সেই নিষ্ঠুর-মূর্তি চীনা রণদেবতার জুকুটি-কুটিল মুখ মনে পড়লো ওর।—রণদেবতা ওদের তাঁর ফাঁদে ফেলেছেন—

একটা প্লেন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা বস্তির ওপরে দুটো বোমা ফেললে—ভীষণ আওয়াজ হোল—অন্ধকারের মধ্যে একটা আঙনের শিখার চমক দেখা গেল, কিন্তু লোকজনের চোঁচামেচি শোনা গেল না। মার্কিন পুলিশম্যানটি বন্ধে—পঞ্চগশ পাউন্ডের বোমা! দেখেছ কি কাণ্ডটা করলে বস্তিতে! লোক সব নিশ্চয় পালিয়েছে।

সুরেশ্বর বন্ধে—ওই দেখ, আর একদল বন্ডার দেখা দিয়েছে দক্ষিণপূর্ব কোণে—

অন্তত বারোখানা সারবন্দী হয়ে এগিয়ে আসছে। এরা যে এলোমেলো ভাবে বোমা ফেলছে না, তা বেশ বোঝা গেল—এদের ধ্বংস-লীলার মধ্যে প্ল্যান আছে, শৃঙ্খলা আছে, সমস্ত শহরটা এবং তার প্রান্তস্থিত এই দরিদ্র পল্লী চা-পেই ও অন্যান্য ছড়ানো গ্রামগুলোকে ওরা যেনকতকগুলো কাল্পনিক অংশে ভাগ করে নিয়েছে এবং নিয়ম করে প্রত্যেক অংশে বোমা ফেলছে—কোনো অংশ পরিভ্রাণ না পায়।

বিমল লক্ষ্য করলে অন্ধকারের মধ্যে বস্তির লোকজনেরা খানা-নালার মধ্যে অনেকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—একটা লোক একটা গাছের গুঁড়িতে প্রাণপণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না—মেয়ে কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না, যেন ভীত, সন্ত্রস্ত প্রেতমূর্তি। সন্ধ্যাবেলার সেই বেপরোয়া ভাব আর নেই।

একমুঠো ছড়ানো নক্ষত্রের মতো কতকগুলো বোমা পড়লে দূরের একটা পাড়ায়— সাংহাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র সে জায়গাটা—পুলিশম্যানগুলো বলাবলি করছে, ওদিকে সেই প্লেনগুলো আবার আসছে, তবে এবার সার্চলাইটজ্বালায় নি, অন্ধকারেই আসছে। কাছেই একটা পল্লীতে ওরা ছটা বোমা ফেলে, আন্দাজ এক একটা পঞ্চগশ পাউন্ড ওজনের। পুলিশের ডেপুটি মার্শালের আদেশে ওরা সবাই সেদিকে ছুটলো। সেখানে এক ভীষণ দৃশ্য! রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, ভয়ের চোটে সতর্কতা ভুলে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীঘর চুরমার, আয়না, মাদুর, টেবিল, ছবি সব ছিটকে রাস্তায় এসে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে—তারই মধ্যে এক জায়গায় একটা প্রৌঢ়া মহিলার ছিন্নভিন্ন বিকৃত মৃতদেহ। কিছুদূরে একটি সুন্দরী বালিকা দেহ দুটুকরো হয়ে পড়ে আছে, তলপেটের নাড়িভুঁড়ি খানিকটা বেরিয়ে ধুলোতে লুটিয়ে পড়েছে।

এই সব বীভৎস দৃশ্যের মাঝখানে এক জায়গায় একটা ছোট মেয়ে ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে চোখ বুজে ছুটে একটা ছোট মাঠ পার হয়ে পালাচ্ছিল—পুলিশের লোক ওকে ধরে ফেলে। মেয়েটির বয়স ন'বছর—সে ভয়ে এমনি দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে না।

ওর হাতে একটা পুঁটুলি। পুঁটুলির মধ্যে কিছু শুকনো গুয়ারের মাংসের টুকরো আর গোটাকতক কিশমিশ। তাকে খানিকক্ষণ ধরে জিগ্যেস করার পরে জানা গেল তাদের বাড়ীতে বোমা পড়বার পরে বাড়ী ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কে কোথায় গিয়েছে তা সে জানে না। সে কিছু খাবার সংগ্রহ করে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে—তাঁর বিশ্বাস, চোখ বুজে ছুটে পালালে বোমা ফেলে যারা, তারা ওকে দেখতে পাবে না। তাকে ডেকে নিয়ে প্রৌঢ়া মহিলার মৃতদেহ দেখানো হোল।

খুকী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, ওই তার মা। পাশের বালিকাটি তার দিদি। ডেপুটি মার্শাল পাড়ার একজন লোক ডেকে মেয়েটির নাম ধাম, বাপের ঠিকানা জেনে নিলেন, কারণ ছেলেমানুষ পুলিশের প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো দিতে পারবে না। মেয়েটি পুলিশের জিম্মাতেই রইল— কারণ শোনা গেল ওর বাবা বছর-তিন মারা গিয়েছেন, বিধবা মা আর দিদি ছাড়া সংসারে ওর আর কেউ ছিল না।

একদল লোককে দেখা গেল ভাঙা বাড়ীগুলো থেকে জিনিসপত্র, মৃতদেহ টেনে বার করছে। ওরা টর্চ জ্বলে টর্চের মুখ নীচের দিকে নামিয়ে মৃতদেহ কি জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাছে ওপর থেকে বোমারু প্লেনগুলো টের পায়।

বিমল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলে। সাগ্রহে সে ছুটে গেল—প্রোফেসর লি, প্রোফেসর লি—

অন্ধকারের মধ্যে বিমলকে উনি চিনলেন। বন্ধন—আমি আমার ছাত্রের দল নিয়ে বেরিয়েছি, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার মেয়েরা কোথায়?

এই সৌম্যদর্শন, পরহিতব্রতী বৃদ্ধের স্নেহ-সম্ভাষণে বিমলের মন আর্দ্র হয়ে উঠলো। বন্ধে— সে অনেক কথা। আমার মনে হয় আপনি এবং আপনার দলই এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

প্রোফেসর লি হাসিমুখে বল্লেন—যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব আলোচনা করতে এসেছিলুম, জানেন তো? এর চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কোথায় পাবো সে আলোচনার?

হঠাৎ একটা প্লেন মাথার ওপর এল। সবাই কথা বন্ধ করে ওপর দিকে চাইলে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি চোঁচিয়ে উঠল—কভার! কভার!

কোথায় আর আশ্রয় নেবে, সেই ভাঙা বাড়ীর ইটকাঠের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ছাড়া। সবাই সেই দিকে ছুটলো। বিমলও চীনা খুকীটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো সেই দিকে।

প্লেন থেকে বোমা পড়ল না। পড়লো কতকগুলো চকচকে রূপোর বাতিদানের মতো লম্বা লম্বা জিনিস। প্লেনটা চলে গেলে ওরা সেগুলো দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখলে। সরু সরু রূপোর নলের মতো জিনিস, হাতখানেক লম্বা। ঝকঝকে সাদা। মার্কিন পুলিশম্যান একটা হাতে তুলে নিয়ে বন্ধে—ইন্সেনডিয়ারি বম্ব—আগুন লাগাবার বোমা—এলুমিনিয়াম আর ইলেকট্রনের খোল, ভেতরে এলুমিনিয়াম পাউডার আর আয়রন অক্সাইডে ভর্তি। এই দেখ ছটা করে ফুটো টিউবের গোড়ার দিকে। এই দিয়ে আগুনের ফুলকি বার হয়ে আসবে। এ আগুন নিবানো যায় না।

জাপানীদের মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার পর লোকজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেকিকে পালাবে, তখন ওরা শহরে ইন্সেনডিয়ারি বম্ব ফেলে আগুন লাগিয়ে দেবে, আগুন নিবোতে কে এগোবে তখন!

কি ভীষণ ধ্বংসের আয়োজন! বিমল সেই ঝকঝকে পালিশ করা সরু টিউবটা হাতে নিয়ে শিউরে উঠলো। এই টিউবের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিদেব এখনি জেগে উঠে এই এত বড় সাংহাইশহরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, তারই আয়োজন চলছে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি বন্ধে—পঁয়ষটি গ্রাম এলুমিনিয়াম পাউডার আর পঁয়ত্রিশ গ্রাম আয়রন অক্সাইড। আমাদের মার্কিন নৌবহরের উডোজাহাজে আজকাল এর চেয়েও ভাল বোমা তৈরী হচ্ছে—আয়রন অক্সাইডের বদলে দিচ্ছে—

কাছেই আরও দু'তিনটা রূপোর বাতিদান পড়লো।

দিনের বেলায় ওরা পরস্পরের ধুলো কাদা মাখা চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রোফেসর লি তখনও কাজে ব্যস্ত, চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে লোকজন টেনে বার করে বেড়াচ্ছেন, তিনি আর তাঁর ছাত্রেরা। পুলিশও এসেছে, দুটো রেডক্রসের হাসপাতাল গাড়ীও এসেছে। আকাশে জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর চিহ্ন নেই।

রাত্রিটা কেটে গিয়েছে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো। বেলা এখন দশটা—এখনও সে দুঃস্বপ্নের জের মেটে নি। বিনা কারণে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার তাণ্ডব যে চলতে পারে তা এর আগে, ভারতবর্ষে থাকতে বিমল কখনো ভেবেছিল?

কনশেসনে সেই সবজাস্তা আমেরিকান পুলিশটা বলছিল—দেখবেন ওরা ইন্সেনডিয়ারি বোমা ফেলে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করবে। এখানে অনেক বাড়ীই কাঠের। তাতে আবার বোমার আগুন জলে নেবে না। বালি ছড়াতে হয় একরকম কল দিয়ে। প্রথম অবস্থায় বোমাটাকে বালি বোঝাই থলে দিয়ে চেপে ধরলে আর স্পার্ক ছোটে না—কিন্তু সে সব করে কে?

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—কিন্তু সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমায়। কাল সন্ধ্যা ও রাতের বোমা ফেলার দরুন চা-পেই পাড়া ও সাংহাইয়ের চ্যাং সো লীন এভিনিউতে সাত আটশো বাড়ীর চিহ্ন নেই—মানুষ মারা পড়েছে তিনশোর ওপর, মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে প্রায় পাঁচশো। তাদের মধ্যে অর্ধেকের বাঁচবার আশা নেই।

প্রোফেসর লি বল্লেন—আমাদের সব চেয়ে ভীষণ শত্রু যে এই বোমারু প্লেনগুলো, তা কদিনের ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারছি। তবুও তো এখনো ওরা সমবেতভাবে আক্রমণ করে নি—করলেও একশোখানা প্লেনের প্রত্যেক প্লেনখানা থেকে দু'টন বোমা ফেললে পাঁচ হাজার লোক কালই মেরে ফেলতো।

সবজান্তা পুলিশম্যানটি বন্ধে—জাপানী বয়সরাগুলো এক একখানা দু টন বোমা বইতে পারে মশায়—সে পারে জার্মান ডর্নিয়ের কিংবা ইটালির কাপ্রোনি—কিংবা—

ডেপুটি মার্শাল বন্ধে—আহা-হা, ও সব এখন থাক—ও তর্কে কি লাভ আছে? এখন আমাদের দেখতে হবে যে দুটি মার্কিন মহিলাকে কাল রাত্রে গুগুরা নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের উদ্ধারের কি উপায় করা যায়, বোমা এখন এবেলা অন্ততঃ আর পড়বে না—

এমন সময় একজন চীনা পুলিশ সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে ছুটে এসে সংবাদ দিলে, কনসেশন অঞ্চলে চীনা পলাতক নরনারীদের সঙ্গে কনসেশন পুলিশের ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। ওরা ইয়াংসিকিয়াং-এর ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছিল, কনসেশন পুলিশ ব্রিজের ওমুখে মেশিনগান বসিয়েছে—তারা বলেছে এত পলাতক লোক জায়গা দেবার স্থান নেই কনসেশনে। খাবার নেই, জল নেই। গেলে সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে।

প্রোফেসর লি বন্ধে—কত লোক পালাচ্ছিল?

—তা বোধ হয় দশ হাজারের কম নয়। অর্ধেক সাংহাই ভেঙে মেয়ে-পুরুষ সব পালাচ্ছে কনসেশনের দিকে। আপনারা সব চলুন, একটু বোঝান ওদের। রাত্রির ব্যাপারে সব ভয় খেয়েছে বড্ড।

কনসেশনের পুলিশদলকে চলে যেতে উদ্যত দেখে বিমল বন্ধে—আজই মেয়ে দুটির ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে—দেরি হোলে ওদের খুঁজে বার করা শক্ত হবে হয় তো!

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বন্ধে—সে বিষয়ে ওঁরা কিছু সাহায্য করতে পারবেন না। আমাদের বদমাইশদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে। আমি আজ এখুনি এর ব্যবস্থা করছি। ব্যস্ত হবেন না—বিদেশী গবর্নমেন্টের কাছে এজন্যে আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী।

সেদিন সারাদিন ওরা হাসপাতালে গেল না। ডাক্তার সাহেবকে জানিয়ে দিলে মিনি ও এ্যালিসের বিপদের কথা। কনসেশনের যাবার জন্যে দু—বার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হোল না। সে পথ লোকজনের ভিড়ে বন্ধ হয়ে আছে, তা ছাড়া ইয়াংসিকিয়াংয়ের পুলের ওপারের মুখে মেশিনগান বসানো।

সারাদিন ধরে কি করুণ দৃশ্য সাংহাইয়ের বাইরের বড় বড় রাজপথগুলিতে! লোকজন মোট-পুঁটুলি নিয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে—সাংহাই থেকে হোনান্ যাবার রাজপথ পলাতক নরনারীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভয়ানক গরমে এই ভিড়ে অনেকে সর্দিগর্মি হয়ে মারাও পড়ছে।

দুখানা হাসপাতালের গাড়ী ওদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু ভিড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে গাড়ি দুখানা শহরের উপকণ্ঠে এক জায়গায় পথের ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। একখানা গাড়ীর চার্জ নিয়ে বিমল সেখানে রয়ে গেল। সুরেশ্বর রইল তার সহকর্মী হিসেবে।

শীঘ্রই কিন্তু কি ভয়ানক বিপদে পড়ে গেল দুজনেই! ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিল এই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে জাপানী প্লেন যদি বোমা ফেলে, তবে যে কি কাণ্ড হবে তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

বেলা দুটো বেজেছে। একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী মোটরবাইকে সাংহাইয়ের দিক থেকে এসে ওদের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর সামনে নামলো। বন্ধে—আপনারা এখান থেকে সরে যান—

বিমল বন্ধে—কেন?

—জাপানী সৈন্য শহরের বড় পাঁচিল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে—এখনো দুটো পাঁচিল বাকী—কিন্তু সঙ্ক্যার মধ্যে ওরা সমুদ্রের ধারে সমস্ত দিকটা দখল করবে। আর আমরা খবর পেয়েছি পঞ্চাশখানা বোমারু প্লেন একঘণ্টার মধ্যে শহরের ওপর আবার বোমা ফেলবে।

—এই লোকগুলোর অবস্থা তখন কি হবে?

—চীনের মহা দুর্ভাগ্য স্যার। আপনারা বিদেশী, আপনাদের প্রাণ আমরা বিপন্ন হতে দেবো না। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই, আপনারা সরে যান এখান থেকে।

একটি গাছের তলায় একটি বৃদ্ধা বসে। সঙ্গে একটা পুঁটুলি, গোটাকতক মাটির হাঁড়িকুড়ি। মুখে অসহায় আতঙ্কের চিহ্ন।

সামরিক কর্মচারীটি কাছে গিয়ে বললে—কোথায় যাবে?

বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সৈনিকটির দিকে চাইলো কিন্তু চুপ করে রইলো, উত্তর দিলে না। সৈনিকটি আবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবে তুমি? তোমার সঙ্গে কে আছে?

এবারও বুড়ী কিছু বলল না।

বিমল বলল—বোধ হয় কানে শুনতে পায় না। দেখছ না ওর বয়েস অনেক হয়েছে। চেষ্টা করে বল!

তরুণ সামরিক কর্মচারী বৃদ্ধার নাতির বয়সী। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বলল—ও দিদিমা, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল—কোথায় আর যাবো? সবাই যেখানে যাচ্ছে।

—এখানে বসে থাকো না। বোমা পড়বে এফুনি। সঙ্গে কেউ নেই?

বোমার কথা শুনেই বুড়ী আড়ষ্ট হোল, ওপরের দিকে চাইলে। বলল—আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমার কেউ নেই, আমাকে তোমরা একখানা গাড়ীর ওপর উঠিয়ে দাও।

বিমল বলল—আমি ওকে এ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড বয়েস হয়েছে, এতখানি পথ ছোটোছুট করে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে।

দুজনে ওকে ধরাধরি করে গাড়ীতে এনে ওঠালে।

এক জায়গায় একটি গৃহস্থ পরিবারের ঠিক এই অবস্থা। গৃহিণীর বয়েস প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ, সাত আটটি ছেলেমেয়ে, সকলের ছোটটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, বাকী সব দুই চার, পাঁচ, সাত এমনি বয়েসের। সঙ্গে একটিও পুরুষ নেই। ওরাও হাঁটতে না পেরে বসে পড়েছে।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল বাড়ীর কর্তা জাহাজে কাজ করেন—জাহাজ আজ কুড়ি দিন হোল বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছে। এদিকে এই বিপদ! কাজেই মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ী থেকে—কোথায় যাবেন ঠিক নেই।

এদের অসহায় অবস্থা দেখে বিমলের খুব কষ্ট হোল। কিন্তু তার কিছু করবার নেই। কত লোককে সে হাসপাতালের গাড়ীতে জায়গা দেবে?

সেদিন শহরের এমন ভয়ানক অবস্থা গেল যে কে কার খোঁজ রাখে। মিনি ও এ্যালিসের উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই হোল না। সারা দিনরাত এমনি করে কাটলো।

রাত্রি-শেষে জাপানী নৌসেনা সাংহাই শহরের দক্ষিণ অংশ অধিকার করলে। বিমল ওসুরেশ্বর তখন হাসপাতালে। ওরা কিছুই জানতো না। তবে ওরা এটুকু বুঝেছিল যে অবস্থা গুরুতর। সারারাত্রি ধরে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ থেকে গোলা বর্ষণ করলে। বোমার প্লেনগুলোর তেমন আর দেখা নেই, কারণ শহর প্রায় জনশূন্য। পথেঘাটে লোকজনের ভিড় নেই বললেইচলে।

রাত তিনটে। এমন সময় ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য ঢুকতে দেখে বিমল প্রথমটা বিস্মিত হোল; তারপরই ওর মনে হোল এরা চীনা নয়, জাপানী সৈন্য। ক্রমে পিল্পিল্প করে বিশ-ত্রিশজন জাপানী সৈন্য হাসপাতালের বড় হলটার মধ্যে ঢুকলো। চারিদিকে শোরগোল শোনা গেল। রোগীর দল অধিকাংশই বোমায় আহত নাগরিক, তারা ভয়ে কাঁঠ হয়ে রইল জাপানী সৈন্য দেখে।

বিমল একা আছে ওয়ার্ডে। হাসপাতালের বড় ডাক্তার খানিকটা আগে চলে গিয়েছেন। ওই এখন কর্তা। দুজন চীনা নার্স ভয়ে অন্য ওয়ার্ড থেকে ছুটে এসে বিমলের পেছনে দাঁড়ালো।

হঠাৎ একজন জাপানী সৈন্য বন্দুক তুলে জমির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ধরলে—রাইফেলের আগার ধারালো বেয়নেট ঝকঝক করে উঠলো। চক্ষের নিমেষে সে এমন একটা ভঙ্গি করলে তাতে মনে হোল বিমলের দেশে সিঁটকি জালে মাছ ধরবার সময় জালের গোড়ার দিকের বাঁশটা যেমন কাদাজলের মধ্যে ঠেলে দেয়—তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানুষিক আর্তনাদ শোনা গেল। পাশের বিছানায় একটা চীনা যুবক রোগী শুয়ে ভয়ে ভয়ে ওদের দিকে চেয়েছিল—বেওনেট তার তলপেটটা গিঁথে ফেলেছে। চারিদিকে রোগীরা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো। রক্তে ভেসে গেল বিছানাটা। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

বিমলের মাথা হঠাৎ কেমন বেঠিক হয়ে গেল এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখে। সে এগিয়ে এসে ইংরাজিতে বললে—তোমরা কি মানুষ না পশু?

জাপানী সৈন্যেরা ওর কথা বুঝতে পারলে না—কিন্তু ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি ও গলার সুর শুনে অনুমান করলে মানে যাই হোক, প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা তা নয়।

অমনি সব ক'জন সৈন্য ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুললে।

বিমল চোখ বুজলে—ও-ও বুঝলে এই শেষ।

সেই দুজন চীনা তরুণী নার্স, যারা ওর পেছনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে চেষ্টা করে উঠলো। হাসপাতালের সবাই বিমলকে ভালবাসতো।

এমন সময় বিমলের কানে গেল পেছন থেকে একটা সামরিক আদেশের ক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ সুর। জাপানী ভাষায় হোলো ও তার অর্থ যেন কোনো অদ্ভুত উপায়ে বুঝে ফেলে চোখ চাইলে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন জাপানী সামরিক কর্মচারী, লেফটেনেন্টের ইউনিফর্ম পরা। সৈন্যেরা ততক্ষণে বেওনেট নামিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছে।

জাপানী অফিসারটি এগিয়ে এসে জাপানী ভাষাতেই কি প্রশ্ন করলে। তিন-চারজন সৈন্য একসঙ্গে ওর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভাঙা ইংরাজিতে বললে—তুমি আমার সৈন্যদের গালাগালি দিয়েছ?

বিমল বললে—তোমার সৈন্যেরা কি করেছে তা আগে দেখ। এটা রেডক্রস হাসপাতাল। এখানে কেউ যোদ্ধা নেই। অকারণে তোমার সৈন্যেরা আমার ওই রোগীটিকে খুন করেছে বেওনেটের ঘায়ে।

জাপানী অফিসার একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রক্তাক্ত বিছানা ও মৃত রোগীর দেহটার দিকে চেয়ে দেখলে এবং তারপর সম্ভবতঃ ভর্তসনার সুরে সৈন্যদের কি বললে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বললে—তুমি কোন দেশের লোক?

—ভারতীয়।

—রেডক্রসের ডাক্তার?

—না, আমি চীনা মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার।

—ও, চীনেদের সাহায্য করতে এসেছ ভারতবর্ষ থেকে?

—হ্যাঁ।

—আমার সৈন্যদের অপমান করতে তুমি সাহস কর?

—আমার সামনে আমার রোগী খুন করলো ওরা, তার প্রতিবাদ মাত্র করেছি।

হঠাৎ জাপানী অফিসারটি ঠাস করে একটা চড় মারলে বিমলের গালে। পরক্ষণেই সেই ক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট সামরিক আদেশের সুর গেল ওর কানে—রাগে অপমানে, চড়ের প্রবল ঘায়ে দিশাহারা ওর কানে। সব ক'জন সৈন্য মিলে তক্ষুনি ওকে ঘিরে ফেলে চক্ষের নিমেষে। দুজন ওকে পিছমোড়া করে বাঁধলো চামড়ার কোমরবন্ধ দিয়ে। তারপরে ওকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে চললো রাইফেলের কুঁদোর ধাক্কা দিতে দিতে। চীনে নার্স দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল।

বিমলকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হোল, সেখানটা একটা ছোট মাঠের মতো। একদিকে একটা নীচু বাড়ী।

মাঠের একপাশে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার পেতে জনৈক জাপানী সামরিক কর্মচারী বসে। তার চারিপাশে সশস্ত্র জাপানী সৈন্যের ভিড়। কিছুদূরে দেওয়াল থেকে পনেরো হাত দূরে একসারি রাইফেলধারী সৈন্য দাঁড়িয়ে। আরও অনেক জাপানী সৈন্য মাঠটার মধ্যে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

এ জায়গাটাতে কি হচ্ছে বুঝতে পারলে না।

ওকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কিছুদূরে দাঁড় করালে সৈন্যরা, তখন ও চেয়ে দেখলে দুজন চীনােকে জাপানী সৈন্যরা ঘিরে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। চেয়ারে উপবিষ্ট জাপানী অফিসারটি কি জিজ্ঞেস করছে সৈন্যদের। চীনা দুটি সৈন্য নয়, সাধারণ নাগরিক, বিমল ওদের দেখেই বুঝলে। একটু পরেই জাপানী অফিসারটি কি একটা আদেশ দিয়ে হাত নেড়ে চীনা দুটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললে।

জাপানী সৈন্যরা তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের ওদিকে যে বাড়ীটা, তার দেওয়ালের গায়ে নিয়ে দাঁড় করালে।

চীনা লোক দুটির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে—তারা কলের পুতুলের মতো জাপানীদের সঙ্গে চললো বটে, কিন্তু তাদের চোখের অবাক ভাব দেখে মনে হয় তারা বুঝতে পারে নি কেন তাদের দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে।

বিমলও প্রথমটা বুঝতে পারে নি, সে বুঝলে—যখন দশজন জাপানী সৈন্যের সারি এক যোগে রাইফেল তুলে।

একটা ভীষণ স্পষ্ট, সামরিক আদেশ বাতাস চিরে উচ্চারিত হোল, সঙ্গে সঙ্গে দশটি রাইফেলের এক যোগে আওয়াজ। বিমল চোখ বুঁজলে।

যখন সে চোখ চাইলে, তখন প্রথমেই যে কথা তার মনে উঠলো, স্থান ও অবস্থা হিসেবে সেটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার বলতে হবে। তার সর্বপ্রথম মনে হোল—জাপানী রাইফেলের ধোঁয়া তো খুব বেশী হয় না! কেন একথা তার মনে হলো এই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে—জীবনের এই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্তে, কে তা বলবে?

তারপরই বিমল দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা দুটি উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দুজন জাপানী সৈন্য তাদের মৃতদেহের পা ধরে হিঁচড়ে টেনে একপাশে রেখে দিলে। তারা পাশাপাশি পড়ে রইল এমন ভাবে, দেখে বিমলের মনে হোল ওরা কোনো ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে প্রণাম করছে।

মানুষকে মানুষ যে এমন ভাবে হত্যা করতে পারে, বিমল তা আজ প্রথম দেখেছে হাসপাতালে, আর দেখলে এখন।

এবার বিমলের পালা, বিমল ভাবলে।

কিন্তু চেয়ে দেখলে আর চারজন চীনােকে আবার কোথা থেকে নিয়ে এসে জাপানী সৈন্যরা টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

এবারও পূর্বের মতো কথা-কাটাকাটি হোলো জাপানী অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে।

তারপর আবার পূর্বের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। এই চীনা চারজনও উপুড় হয়ে পড়লো দেওয়ালের সামনে আগের দুজনের মতো।

চীনা ভাষা যদিও বা কিছু কিছু শিখেছে বিমল, জাপানীভাষার তো সে বিন্দুবিসর্গ জানে না। কেন যে এদের গুলি করে মারা হচ্ছে, কি অপরাধে এরা অপরাধী, কিছু বোঝা গেল না। আর এখানে জাপানীরাই কথাবার্তা বলছে, চীনাদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

বিমল ভাবছিল—এই দূর বিদেশে এখনি তার প্রাণ বেরুবে। মা-বাবার সঙ্গে আর দেখা হোলো না, হয় তো তাঁরা জানতেও পারবেন না যে তাঁর কি হয়েছে। শুধু একখানা চিঠি যাবে তাঁদের কাছে, তাতে লেখা থাকবে, ছেলে তাঁদের ‘মিসিং’—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!...কিন্তু এ্যালিসের কি হলো! এ্যালিসের সঙ্গেও আর দেখা হবে না। এ্যালিসকে বড় ভাল লেগেছিল। কোথায় যে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে! বেচারী এ্যালিস! বেচারী মিনি!

কিন্তু বিমলের পালা আসতে বড় দেরি হতে লাগলো।

দলে দলে চীনা নাগরিকদের টেবিলের সামনে দাঁড় করানো চলতে লাগলো। তারপর তাদের হত্যা করাও সমানভাবে চলছে।

মৃতদেহ ক্রমেই স্তুপাকার হয়ে উঠেছে।

এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা-দৃশ্য আর দেখা যায় না চোখে।

বিমলকে এইবার দুজন জাপানী সৈন্য নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। বিমল অনুভব করলে তার ভয় হচ্ছে না মনে—কিন্তু কি একটা জিনিস হচ্ছে।

জ্বর আসবার আগে যেমন গা বমি-বমি করে, ওর ঠিক তেমনি হচ্ছে শরীরের মধ্যে। মাথাটা যেন হঠাৎ হালকা হয়ে গিয়েছে, আর কেমন যেন বমির ভাব হচ্ছে।

জাপানী সামরিক অফিসারটি ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে—তুমি রাস্তায় কি করছিলে?

বিমল ইংরেজিতে বললে—রাস্তায় সে কিছু করেনি। হাসপাতাল থেকে তাকে ধরে এনেছে।

—কোন হাসপাতাল?

—চীনা রেডক্রস হাসপাতাল।

—তুমি সেখানে কি করছিলে?

—আমি ডাক্তার। ডিউটিতে ছিলাম, জাপানী সৈন্যরা একজন চীনা রোগীকে অকারণে বেওনেটের খোঁচায়—

পেছন থেকে দুজন জাপানী সৈন্য ওকে রক্ষা করে কি বললে, বিমলের মনে হোলো তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

জাপানী অফিসারটি বললে—থামলে কেন? বলে যাও—

বিমল হাসপাতালের হত্যাকাণ্ডের কথা সংক্ষেপে বলে গেল।

জাপানী অফিসার চারিপাশের জাপানী সৈন্যদের দিকে চেয়ে জাপানী ভাষায় কি প্রশ্ন করলে। বিমলের দিকে চেয়ে বললে—তুমি সেই সৈন্যকে চিনতে পারবে?

—না। অত ভাল করে দেখি নি তার চেহারা, তখন মাথার ঠিক ছিল না। তা ছাড়া জাপানী সৈন্যরা সবাই আমার চোখে একই রকম দেখায়—দেখতে অভ্যস্ত নই বলে।

—তুমি সিঙ্গাপুরের লোক?

—আমি ভারতবাসী।

—চীনা হাসপাতালে চাকুরী করো?

—হ্যাঁ।

—সরাসরি এসেছ চীনে?

এ প্রশ্ন করবার কারণ বিমল একটু একটু বুঝতে পারলে। এখানে সে একটা মিথ্যে কথা বললে। এই একমাত্র ফাঁক, এই ফাঁক দিয়ে সে এবারের মতো গলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তো করবে। তারপর যা হয় হবে। সে বললে—সরাসরি আসিনি। আন্তর্জাতিক কনসেশনে এসেছিলাম; ব্রিটিশ কনসুলেট আপিসে আমার নাম রেজিস্ট্রি করা আছে।

এই সময় একজন জাপানী সৈন্য কি বললে অফিসারটিকে। তার হাতে তিনটে জরির ব্যান্ড, দেখে মনে হয় সে একজন করপোরাল কিংবা কম্প্যানি কমান্ডার।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে ঝকুটি করে বললে—তুমি একজন গুপ্তচর!

—আমি একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। আমি ডাক্তার। তোমার সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই জানে আমি হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলাম, ওরা ধরে এনেছে।

—আঙুলের টিপসই দাও দুটো এখানে।

বিমল দুখানা কাগজে টিপসই দিলে। তারপর জাপানী অফিসার কি আদেশ করলে জাপানী ভাষায়, ওকে দুজন জাপানী সৈন্য ধরে নিয়ে গিয়ে বাইরে একটা কামানের গাড়ীর উপর বসালে। চারিধারে বহু জাপানী সৈন্য গিজ গিজ করছে। সকলেই ব্যস্ত, উত্তেজিত। কোথায় যাবার জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র উৎসুক।

বিমল দেখলে তাকে এরা ছেড়ে দিলে না। মুক্তি যে দিয়েছে তা নয়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? জাপানী ভাষার সে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না। মিনিট পনেরোর

মধ্যে ঘড়ঘড় করে কামানের গাড়ী টানতে লাগলো একখানা মোটর লরি। ওর দুদিকে সাঁজোয়া গাড়ী চলেছে সারি সারি।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড শহর, এর আর যেন শেষ নেই, ঘণ্টা দুই চলবার পরে শহরের বাড়ী ঘর ক্রমে কমে আসতে লাগলো। ফাঁকা মাঠ আর ধানের ক্ষেত। চীনদেশের এ অংশের দৃশ্য ঠিক যেন বাংলাদেশ, তবে এখানে কাছাকাছি নীচু পাহাড়শ্রেণী চোখে পড়ে।

কিছুদূরে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপারে ঘন ধোঁয়া। রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ আসছে।

এক জায়গায় মাঠের মধ্যে পাইন বন। সেখানে কামানের গাড়ী দাঁড়ালো। বিমল দেখলে একটু উঁচু ঢালু মতো জায়গায় লম্বা সারি দিয়ে জাপানী সৈন্যরা উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেল ধরে ছুঁড়ছে, একসঙ্গে পঞ্চাশ ঘাটটা রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে।

ওপাশ থেকেও তার জবাব আসছে : এটা যে যুদ্ধক্ষেত্র এতক্ষণ পরে বিমল বুঝতে পারলে। ওদিকে চীনা নাইন্থ রুট আর্মি জাপানীদের বাধা দিচ্ছে—চীনা সৈন্যবাহিনী সাংহাই ছেড়ে হটে গিয়েছে বটে, কিন্তু জাপানীদের আর এগোতে দেবে না।

আর একটু পরে বিমল লক্ষ্য করে দেখলে, পাইন বনের একপাশে গাছের তলায় একরাশ মৃতদেহ জাপানী সৈন্যের। স্ট্রেচারে করে বিমলের চোখের সামনে আরও দুজন মরা কি জ্যান্ত সৈন্যকে নিয়ে এল, বিমল বুঝতে পারলে না। একটু পরে আহতদের আর্ন্তনাদ কানে যেতেই চিকিৎসক বিমল চঞ্চল হয়ে উঠলো। পাশের একজন জাপানী সৈন্যকে বন্ধে পিজিন ইংলিশে—আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমি ডাক্তার, ওদের দেখবো।

সব মানুষের দুঃখই সমান। দুঃখপীড়িত মানুষের জাত নেই—তারা চীনা নয়, জাপানীও নয়। একটু পরে জাপানী অফিসারের সম্মতিক্রমে বিমল হতাহত সৈন্যদের কাছে গেল দেখতে, যদি তার দ্বারা কোনো সাহায্য হয়। যদি মড়ার গাদায় জড়ো করা সৈন্যদের মধ্যে দু-একজন সাংঘাতিক আহত লোক বার হয়—কারণ আর্ন্তনাদ সেই গাদার মধ্যে থেকেই আসছিল।

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

বইয়ে পড়া বা কল্পনায় দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

একটা শান্ত পাইন বন, গোটা তিনেক কামানের গাড়ী, রাইফেল হাতে কতকগুলি সৈন্য উপুড় হয়ে আছে—ওপারে পাহাড়ের ওপর কিছু ধোঁয়া।—

কেবল সম্মুখের হতাহত জাপানী সৈন্যগুলি পরিচয় দিচ্ছে যে বিমল কোনো শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই—যেখানে সে রয়েছে সেখানে মানুষের জীবন-মরণের সঙ্গে সম্পর্ক বড় বেশী।

কিন্তু ওষুধপত্র কিছু নেই যা দিয়ে এই সব আহত সৈনিকদের চিকিৎসা চলে। এমন কি খানিকটা আইডিন পর্যন্ত বিমল অনেককে বলেও জোটাতে পারলে না। এদের হাসপাতাল শিবির অনেক দূরে—সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নেই।

জাপানী সৈন্যরা কিন্তু দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপারে চীনা সৈন্যদের রাইফেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কারণ যে কি, কিছু বুঝলে না।

আবার কামানের গাড়ীতে চড়ে সৈন্যবেষ্টিত হয়ে যাত্রা।

এবার জাপানীরা বিমলের সঙ্গে খানিকটা ভাল ব্যবহার করলে, কারণ আহত জাপানী সৈনিকদের ও যথেষ্ট সেবা করেছে। ও যে সাধারণ সৈনিক বা স্পাই নয়, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার—এই বিশ্বাস জন্মেছে সকলেরই।

পাহাড়ের ওপারে অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সৈন্যশিবির। ওর মধ্যে ঢুকেই বিমল বুঝতে পারলে, এটা চীনা আর্মির হাসপাতাল—প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল এখানে—এখন কিছু নেই, চীনা সৈন্য সব সঙ্গে করে নিয়ে পালিয়েছে, কেবল একটা বড় দস্তার টব পড়ে আছে—আর কিছু ব্যান্ডেজের তুলো। হাসপাতাল শিবির থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক গাছের তলায় এক চীনা সৈন্যকে পাওয়া গেল—হতভাগ্য গুরুতর আহত। রাইফেলের গুলি বোধহয় জাপানীদের, তার শরীরের দুই জায়গায় বিঁধেছে—রক্তে তার ইউনিফর্ম ভিজে উঠেছে। এ-কে যে ওর বন্ধুরা কেন শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়েছে কিছু বোঝা গেল না।

একজন জাপানী সৈন্য ওর পা ধরে খানিকটা হেঁচড়ে নিয়ে চললো। লোকটার বেশ জ্ঞান রয়েছে—সে যন্ত্রণায় অস্পষ্ট আর্ন্তনাদ করে উঠতেই পেছন থেকে একজন জাপানী অফিসার এগিয়ে গেল তাকে দেখতে।

ওদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে জাপানী ভাষায় কি বলাবলি হোল, বিমল বুঝলে না—হঠাৎ অফিসারটি রিভলবার বার করে আহত সৈনিকের মাথায় নল ঠেকিয়ে গুলি করলে।

লোকটা যেন রিভলবার ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়লো। ওর সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

বিমল শিউরে উঠলো—চোখের সামনে এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা দেখতে সে এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। মাইল তিন দূরে একটা চীনা গ্রাম—যুদ্ধক্ষেত্রের বাঁদিক ঘেঁষে। ডানদিকে একটা অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে জাপানী অফিসারটির ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখছে সবাই, সেদিকে আঙুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে—বিমল বুঝলে ওই পাহাড়টি বর্তমানে চীনা নাইন্থ্ রুট আর্মির ঘাঁটি। প্রথম ঘাঁটি ছিল পূর্বোক্ত পাইন বনের সামনের পাহাড়—তা গিয়েছে।

একস্থানে একদল জাপানী সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের পাশ দিয়ে বিমলের দল কামানের গাড়ী নিয়ে চলে গেল। ওরা যেন খুব উত্তেজিত হয়ে কি বলাবলি করছে, বিমল বুঝতে পারলে না। একজন পিজিন ইংলিশ জানা জাপানী সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করলে—ওখানে কি হচ্ছে? সৈন্যটি বললে—শোনো নি তুমি? সাংহাই শহর এখন আমাদের হাতে। আজ সকালে আমাদের হাতে এসেছে।

—অত বড় সাংহাই শহর তোমাদের হাতে সবটা এসেছে?

—সব। ওরা এইমাত্র ফিল্ড টেলিফোনে খবর পেয়েছে।

—যুদ্ধ হোলো কখন?

—কাল সারারাত প্রায় দুশো বম্বার প্লেন বোমা ফেলেছে—শুনেছি বিস্তর লোক মরেছে সাংহাইতে—

—সকলেই সাধারণ নাগরিক বোধ হয়?

—বেশির ভাগ। হাজার দুই তো শুধু চা-পেইতেই মরেছে—আর শুনেছি কনসেশনে বোমা ফেলে ছ'শো পলাতক চীনােকে মারা হয়েছে। ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে—হবেই তো—আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। সাংহাই কি, সারা এশিয়া আমরা দখল করবো—তোমাদের ভারতবর্ষতো বটেই। দেখে নিও তুমি—নাও, এগিয়ে চল।

বিমল ভাবছিল, সুরেশ্বর কি বেঁচে আছে? বোধ হয় নয়। চা-পেই পল্লীর অত্যন্ত কাছে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউতে চীনা রেডক্রস্ হাসপাতাল। জাপানী বম্বারগুলোর বিশেষ দৃষ্টি হাসপাতালের ওপর। কাল রাতেই সুরেশ্বরের ডিউটি থাকবার কথা। সম্ভবতঃ হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে—রোগী, ডাক্তার, নার্স সুদ্ধ। ভাগ্যে এ্যালিসআর মিনি ওখানে ছিল না!

কিন্তু আন্তর্জাতিক কনসেশনে বোমা ফেলে আশ্রয়হীন চীনা নরনারীদের মেরেছে, এ কথাটা বিমলের ভাল বিশ্বাস হলো না। আন্তর্জাতিক কনসেশনে বোমা ফেলতে সাহস করে কখনো? ওটা নিতান্ত বাজে কথা বলছে।

ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক কনসেশনের সম্পর্কে বিমলের এ অলৌকিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব দূর হয়েছিল—সাংহাই অধিকার করবার পূর্বে ও পরে জাপানী বম্বার প্লেনগুলো যে কনসেশনের পবিত্রতা মানে নি—এ সংবাদ বিমল আরও ভাল জায়গা থেকে এর পরে শুনেছিল।

পথের মধ্যে একটা চীনা গ্রাম, বড় বড় ভুটাক্ষেত্রের মধ্যে। তখন সন্ধ্যা হবার বেশী দেবী নেই। পূর্বোক্ত পাহাড় ও পাইনবন থেকে অন্ততঃ পাঁচ মাইল তখন আসা হয়েছে। জাপানী সৈন্যের একটা দল গ্রামটা দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলো—এবং সবাই তক্ষুনি হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে প্রায় বুক ঠেকিয়ে, চুপি চুপি অগ্রসর হোতে লাগলো গ্রামখানার দিকে। বিমল শুধু ভাবছিল, ভগবান করেন—গ্রামটাতে লোক না থাকে—সব যেন পালিয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তা হোল না। এ গ্রামের লোক যুদ্ধের বিশেষ কোনো খবর রাখতো না—সাংহাই থেকে অন্ততঃ পনেরো মাইল দূরে এই গ্রামখানা। এরা বেশ নিশ্চিত ছিল যে চীনা নাইন্থ্-রুট আর্মি তাদের রক্ষা করছে। হঠাৎ যে নাইন্থ্-রুট আর্মি ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছে—তা ওরা সম্ভবতঃ জানতো না।

জাপানী সৈন্যরা গ্রামখানাকে আগে চুপিচুপি গোল করে ঘিরে ফেলে। গ্রামে অনেকগুলো সাদা সাদা খোলার ঘর, খড়ের ঘর। শস্যের গোলা, দোকানপত্রও আছে। বেশ করে ঘেরার পরে জাপানীরা হঠাৎ একযোগে ভীষণ পৈশাচিক চীৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত নরনারী ঘুম ভেঙে বাইরে এসে অনেকে দাঁড়ালো—অনেকে ব্যাপারটা কি না বুঝতে পেরে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে জানালা খুলে চেয়ে দেখতে লাগলো।

তারপর যে দৃশ্যের সূচনা হোল তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানুষিক। বিমলের চোখের সামনে বর্কর জাপানী সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগলো, এবং বিনা দোষে বেওনেটের কিংবা বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত-আটজনকে একদম মেরে ফেললে। ছুতো এই যে, তারা নাকি বাধা দিয়েছিল। বাকীগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে দাঁড় করিয়ে রাখলে—চারিধারে বেওনেট-চড়ানো রাইফেল হাতে জাপানী সৈন্যের দল।

দু-তিনখানা খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দুটো ছোট ছোট বাছুরকে ভয় দেখিয়ে মজা করতে লাগলো, একটা পিচ্ গাছের ডালগুলো অকারণে ভেঙে গাছটাকে ন্যাড়া করে দিলে। তবুও বিমল সবটা দেখতে পাচ্ছিল না—একে অন্ধকার, গ্রামটাও লম্বায় বড়, ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে জানে না—তার সামনে যেগুলো ঘটছে সেগুলো সে কেবল জানে। তবে নারী ও শিশুকণ্ঠের চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, ওদিকে জাপানী সৈন্যেরা ঠিক বুদ্ধদেবের বাণী আবৃত্তি করছে না। মিনিট কুড়ি পঁচিশ এমনি চললো—বেশীক্ষণ ধরে নয়। তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে, কেবল জ্বলন্ত ঘরের চালের আলোয় সামনেটা আলোকিত।

হঠাৎ বিমলের যেন হুঁশ হোল—সে তার আশেপাশে চেয়ে দেখলে তার খুব কাছে কোনো জাপানী সৈন্য নেই—লুঠপাটের লোভে সবাই গ্রামের ঘর-দোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে জটলা করছে।

বিমল একবার পিছনের দিকে চাইলে—সেদিন একখানা কামানের গাড়ী দাঁড়িয়ে। গাড়ীর কাছে সৈন্য নেই। গাড়ীখানা থেকে পঞ্চাশ গজ আন্দাজ দূরে একটা প্রাচীন সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভ। চীনদেশের অনেক পাড়াগাঁয়ে সহমৃত্যু বিধবার এমন পুরোনো আমলের স্মৃতিস্তম্ভ সে আরও দু'একটা দেখেছে। ততদূর পর্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের আলোয়, কিন্তু তার ওপারে অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না।

বিমল আন্তে আন্তে পিছনে হটতে হটতে দশ বারো পা গিয়ে হঠাৎ পেছনে ফিরে ছুট দিয়ে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার আড়ালে একটা অন্ধকার স্থানে এসে দাঁড়ালো।

ওর বুক টিপ্ টিপ্ করছে। যদি জাপানীরা তাকে এখন ধরে, তবে এখুনি গুলি করে মারবে। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হয়ে এভাবে থাকার চেয়ে মৃত্যুপণ করেও মুক্তির চেষ্টা তাকে করতে হবে।

স্মৃতিস্তম্ভটার গায়ে একটা ডোবা। অন্ধকারের মধ্যেও মনে হোল ডোবাটায় বেশ জল। আছে। বিমল তাড়াতাড়ি ডোবার জলে নামলো—তার কেমন মনে হোল জলে নেমে সে যদি গলা ডুবিয়ে থাকে, তবেই সব চেয়ে নিরাপদ—ডাঙায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে বেশীদূর যেতে নাযেতেই সে ধরা পড়বে।

এই ডোবায় নামবার জন্যেই যে এ যাত্রা বেঁচে গেল—সেটা সে খানিকটা পরেই বুঝতে পারলে।

অল্পক্ষণ—বোধ হয় দশ বারো মিনিটের পরেই ভীষণ চিৎকার ও বহু রাইফেলের সম্মিলিত আওয়াজ শোনা গেল। খুব একটা হৈ-চৈ দুপদাপ্ পালানোর শব্দ, আবার চৈচামেচি—একটা ঘোর বিশৃঙ্খলা ভাব।

বিমল তখন ডোবার জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে। যদি ডাঙায় থাকতো তবে অন্ধকারে ছুটন্ত রাইফেলের গুলিতে হয়তো তার প্রাণ যেতো।

ব্যাপারটা কি? বিমল দেখল সেই জাপানী কামানের গাড়ীটা ঘিরে একটা খণ্ডযুদ্ধ ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়েছে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার ওপারে। হ্যান্ডগ্রিনেড্ ফাটাবার ভীষণ আওয়াজে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যেন কেঁপে উঠলো। একটা—দুটো—তিনটে। জাপানী কামানের গাড়ীর কাছ থেকে জাপানী সৈন্যেরা হটে যাচ্ছে একটা বাগানের দিকে।

বিমল এবার ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝলে। চীনা সৈন্যেরা একটা দল জাপানীদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। জাপানীরা ফিল্ড গানগুলো একেবারে ছুঁড়তে পারলে না—দুটোর একটাও না। চীনারা বুদ্ধি করে আগেই সে দুটো কামানই ঘেরাও করে দখল করলে। চীনা সৈন্যর এই দলটা হ্যান্ডগ্রিনেড্ ছুঁড়ে জাপানীদের দলের জটলা ভেঙে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে রাইফেলের ও হ্যান্ডগ্রিনেডের আওয়াজ থেমে গেল। জাপানীরা কামানেরগাড়ী ও বন্দীদের ফেলে পালিয়েছে। বিমল বেশ দেখতে পেলে কাছাকাছি কোথাও জাপানী সৈন্য একটাও নেই। কাদামাখা পোশাকে সতর্কতার সঙ্গে সে ধীরে ধীরে ডোবার জল থেকে উঠলো ডাঙায়।

একজন সৈনিকেরচড়া আওয়াজ তার কানে গেল—কে ওখানে?

বিমল আশ্চর্য্য হোল, এ পুরুষের গলা নয়—মেয়েমানুষের মতো সরু গলা। বিমল কথার উত্তর দেবার আগে দুজন রাইফেলধারী চীনা সৈনিক ওর দিকে এগিয়ে এল ইলেকট্রিক টর্চ হাতে। তারা ওকে দেখে অবাক হোল, বিমলও ওদের দেখে তেমনি অবাক হয়ে গেল।

এরা পুরুষমানুষ নয়, দুজনেই মেয়ে, বয়েসও বেশী নয়। কুড়ি পঁচিশের মধ্যে। বেশ সুশ্রী দুজনেই—সৈন্যবিভাগের আঁটসাঁট খাকী পোশাকে এদের দেহের লাভণ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

তারা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল গ্রামের সদর রাস্তার ওপরে।

অবাক কাণ্ড! সকলেই মেয়ে সৈনিক! এদের মধ্যে পুরুষমানুষ নেই একজনও এই সুশ্রী তরুণীর দল এতক্ষণ হ্যান্ডগ্রিনেড ছুঁড়ছিল এবং এরাই জাপানী ফিল্ড গান্ দুটো ঘেরাও করে দখল করেছে।

বিমলের মনে পড়লো চীনা নাইন্থ-রুট আর্মির সঙ্গে একটি নারী-বাহিনী আছে—সে সাংহাই চীনা রেডক্রস্ হাসপাতালে শুনেছিল বটে।

এরাই সেই চীনা মেয়ে-যোদ্ধার দল।

এদের কম্যান্ডান্ট কিন্তু মেয়ে নয়—পুরুষ। একটা পাইনকাঠের পুরোনো ভাঙা টেবিলের সামনে সম্ভবতঃ একটা উপুড় করা কলসী বা ওই রকম কোনো হাস্যকর জিনিস পেতে খুব লম্বা গোপওয়ালা কম্যান্ডান্ট বসে ছিলেন। মেয়েরা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল সেখানে।

বিমলের মনে হোল সমগ্র নারীবাহিনীর মধ্যে এই লোকটি ইংরাজী জানে এবং বেশ ভাল আমেরিকান্ টানের ইংরাজী বলে।

বিমলের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে প্রশ্ন করলে—তুমি জাপানীদের লোক?

—না। আমি চীনা হাসপাতালের ডাক্তার।

—কোথাকার হাসপাতাল?

—সাংহাইয়ের রেডক্রস হাসপাতাল। আমাকে ওরা বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল।

—তুমি কোন দেশের লোক?

—ভারতবর্ষের। চীনা মেডিকেল ইউনিটের আমি সভ্য।

কম্যান্ডান্ট বিস্ময়ের সুরে বলল—ও! তা ডোবার জলে কি করছিলে?বিমল লজ্জিত হোল এতগুলি মেয়ের সামনে।

বলল—লুকিয়ে ছিলুম। ওদের অসতর্ক মুহূর্তে ওদের হাত থেকে পালিয়ে ডোবার জলে লুকিয়েছিলুম। তারপর হঠাৎ হ্যান্ডগ্রিনেডের আওয়াজ আর চিৎকার শুনলাম, তখনই ভাবলাম চীনা সৈন্য আক্রমণ করেছে ওদের।

কথাবার্তা চলছে এমন সময় গ্রামের পথে কি একটা গোলমাল উঠলো।কম্যান্ডান্টকে ঘিরে যারা ছিল, তারা চমকে উঠে সেদিকে ছুটতে লাগল। আবার কি জাপানী সৈন্যের দল আক্রমণ করেছে?

বিমল চেয়ে দেখল জনকয়েক সৈন্য যেন কাউকে ধরে আনছে—তাদের পেছনে পেছনে অনেক সৈন্য মজা দেখতে আসছে।

ব্যাপার কি? হয়তো কোনো জাপানী সৈন্য ওদের হাতে ধরা পড়েছে, তাকে সকলে মিলে ধরে আনছে নিশ্চয়ই!

কিন্তু দলটি কম্যান্ডান্টের কাছে এসে পৌঁছে যখন ওদের প্রথমত সামরিক অভিবাদনকরে দুজন বন্দীকে এগিয়ে নিয়ে দাঁড় করাল কম্যান্ডান্টের সামনে—বিমল চমকে উঠে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। কারণ

কিছুক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরুলো—এ্যালিস্! মিনি! সামনের শীর্গকায়ী মূর্তি দুটি এ্যালিস্ ও মিনি ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ওদের হাত-পা বাঁধা—মুখে কাপড় দিয়ে বাঁধা। এমন শক্ত করে বাঁধা যে ওদের কথা বলবার উপায় নেই।

ভয়ানক রাগ হোল বিমলের এই মুহূর্তে এই চীনা নারীবাহিনীর ওপর। মেয়ে হয়ে মেয়ের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার! ওদের এমন করে বেঁধে আনার অর্থ কি? ওরা ছিল বা কোথায়?

কম্যান্ডান্ট উত্তেজিত সুরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। ইতিমধ্যে এ্যালিস্ ও মিনির হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হোল। ব্যাপারটা ক্রমশঃ যা জানা গেল তা হোল এই—

চীনা নারীসৈন্যরা এদের গ্রামের একটা ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণে এই অবস্থাতেই পায়। বাইরে থেকে ঘরের দরজা তলা দেওয়া ছিল—কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজে সন্দেহ করে ওরা দরজা ভেঙে দেখতে পায় এদের। ওরা বুঝতে পেরেছে যে এরা ইউরোপীয় বা আমেরিকান মহিলা। কিন্তু চীনের এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে একটা অন্ধকার ঘরের কোণে এদের কে এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তা না বুঝতে পেরে সবাই মহা বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

হঠাৎ বিমল বলে উঠলো—এ্যালিস্! মিনি!

প্রথমে চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে এ্যালিস্। বিমলকে দেখে সে যেন প্রথমটা চিনতে পারলে না—তারপর প্রায় ছুটে ওর কাছে এসে বিস্মিত চকিত আনন্দভরা কণ্ঠে বললে—তুমি এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে মিনিও ছুটে এল। মিনির চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে নানা কষ্টে, উদ্বেগে এবং খুব সম্ভবতঃ অনাহারেও বটে। সে বললে, তোমার বন্ধু কই?

ঘণ্টা কয়েক পরে।

একটা রিচ গাছের তলায় বসে মিনি, এ্যালিস্ ও বিমল কথা বলছিল। এখনও রাত আছে, তবে পূর্ব আকাশে শুকতারা উঠেছে—ভোর হওয়ার বেশী দেরি নেই।

মিনি ও এ্যালিস্ তাদের গল্প বলে যাচ্ছিল। ওদের ভাল করে খেতে দেওয়া হয়নি, কারণ ওদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পেট ভরে খাওয়া ওদের অদৃষ্টে অনেকদিন ধরে জোটেনি।

বিমল বললে—এখানে তোমরা কি করে এলে?

এ্যালিস্ বললে—এখনও ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু বড্ড খুশী হয়েছি তোমায় দেখে, বিমল। আমরা তো আশঙ্কা করছিলাম জাপানীরা আক্রমণ করেছে—এইবার ঘর জ্বালিয়ে আমাদের বন্দী অবস্থায় পুড়িয়ে মারবে—কে আর উদ্ধার করবে আমাদের? আর আমাদের অস্তিত্ব জানেই বা কে?

—কবে তোমরা এ গ্রামে এসেছ?

—আজ তিন দিন হোল খুব সম্ভব—কারণ দিনরাত্রির জ্ঞান আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—কে তোমাদের আনে?

কয়েকজন চীনা দস্যু।

—সাংহাইয়ের চণ্ডুর আড্ডায় তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল ধরে?

এ্যালিস্ বিস্ময়ের সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুমি কি করে জানলে?

বিমল হেসে বললে—আমি আর সুরেশ্বর সেই চণ্ডুর আড্ডাতে যাই তোমাদের খুঁজতে। কিন্তু বড় বিভ্রাট বেধে গেল সে রাত্রে। জাপানী বন্দারগুলো সেই রাত্রে ভীষণ বোমা বর্ষণ শুরু করলে। মিনি বলল, আমরা খুব জানি। আমরা তখন হাতমুখ বাঁধা অবস্থায় একটা গরুর গাড়ীর মধ্যে শুয়ে। একটা বোমা তো আমাদের গাড়ীর পাশেই পড়লো।

এ্যালিস্ বললে—তারপর ওরা আমাদের নানা জায়গায় ঘোরালে। দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ না দিলে আমাদের ছাড়বে না—দেশের বাপমায়ের কাছে চিঠি লিখবে বলে ঠিকানা চেয়েছিল— আমরা দিই নি। আরো ওরা আমাদের শাসিয়েছিল, জাপানী সৈন্যেরা গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে—ঠিকানা যদি না দিই তবে ঘরের মধ্যে বেঁধে

রেখে পালাবে—আমরা নিঃশব্দে পুড়ে মরবো।করেছিলও তাই। চীনা মেয়ে-সৈন্যরা না এলে জাপানীরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। আমরাও পুড়ে মরতাম।

বিমল বললে—কি সর্বনাশ!

এ্যালিস্ বললে—সর্বনাশ আর কি, পুড়ে মরতাম এর আর সর্বনাশ কি? কতই তো মরছে! কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে, বিমল?

—আমাকে হাসপাতাল থেকে জাপানীরা বন্দী করে এনেছিল। আমি নাকি স্পাই। এতদিন গুলি করেই মারতো যদি একথা ওদের না বলতুম যে ব্রিটিশ কনসুলেট আপিসে আমার নাম রেজিস্ট্রি করা আছে।

মিনি বললে—সুরেশ্বর কোথায় গেল একটা খোঁজ করতে হয়। আর আমেরিকান কনসুলেটে আমাদের বিষয়ে একটা খবর দিতে হয়—চলো কম্যান্ডান্টকে বলি।

জনকয়েক তরুণী চীনা মেয়ে-সৈন্য ওদের হাসিমুখে ঘিরে দাঁড়ালো।এদের হাস্যদীপ্ত সুন্দর চেহারা বিমলের বড় ভাল লাগলো, এমন একটা জিনিস নতুন দেখছে সে—বহুশতাব্দীর জড়তা দূর করে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী—রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা, কঠোরতার মধ্যে। দেশের দুর্দিনে দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে তারা আজ মস্ত বড় হোতা—মিথ্যে জড়তা, মিথ্যে লজ্জা-সঙ্কোচ দূর করে ফেলেছে টেনে।

একটি মেয়ে ইংরাজিতে বললে—তোমরা হ্যাংচাউতে রাজকুমারী তাং-এর দেউল দেখেছ?

এ্যালিস্ বললে—না, সে কি?

—পাঁচশো বছর আগে মিং রাজবংশের একজন রাজকুমারী ছিলেন তাং। তাঁর পুণ্যচরিত্র এখনও আমাদের দেশের লোকের মুখেমুখে আছে। এখান থেকে বেশী দূর নয়—দেখে যেও।

বিমল বললে—তুমি বেশ ইংরাজি বলতে পারো তো?

মেয়েটি এমন হাসলে যে তাঁর তেরচা চোখ দুটো বুজে গিয়ে দুটো কালো রেখার মতো দেখাতে লাগলো।

—ভাল ইংরাজি বলছি? তবুও এ ইয়াংকি ইংরাজি! মিশনারী স্কুলে পাঁচ বছর পড়েছিলুম এক সময়ে। ইংরাজি গান পর্যন্ত গাইতে পারি—শুনবে?

হঠাৎ বিউগল বেজে উঠলো।সবাই ব্যস্ত হয়ে কম্যান্ডান্টের তাঁবুর দিকে চললো।এখনি মার্চ শুরু করতে হবে। খবর পাওয়া গিয়েছে জাপানীদের বড় একটা দল এখানে আসছে।

বিমল বাঁ দিকে চেয়ে দেখলে।

একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মতো লম্বা টিবির আড়াল থেকে মাঝে মাঝে যেন সাদা ধোঁয়া বার হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে ফটফট শব্দ হচ্ছে। শব্দটা অনেকটা যেন বিমলদের দেশের লিচুবাগানে পাখী তাড়াবার জন্যে চেরা বাঁশের ফটফট আওয়াজের মতো।

রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ। আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেলে শব্দ হয় খুব কম—বিমল জানতো।

সবাই বললে—মাথা নীচু করো—মাথা নীচু করো—

জাপানী সৈন্যরা আক্রমণ করে ওই টিবিটাতে আড়াল নিয়েছে—কিন্তু হয়তো এখুনি বেওনেট্ চার্জ করবে কিংবা হ্যান্ডগ্রিনেড্ নিয়ে ছুটে আসবে।

চক্ষের নিমেষে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেলের মুখ টিবিটার দিকে ফেরালে। একটি মেয়ে হঠাৎ অস্পষ্ট চীৎকার করে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে গেল—তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে গিয়ে পড়লো আর একটি মেয়ের পিঠের ওপরে—সে কিছু দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলবন্দুক বাগিয়ে। এ্যালিস্ ছুটে উঠে গিয়ে মেয়েটির মাথা নিজের কোলে তুলে নিলে—আশপাশের মেয়েরা বললে—মাথা নীচু—মাথা নীচু—শুয়ে পড়ো—

বিমল শঙ্কিত চোখে অল্পক্ষণের জন্যে এ্যালিসের দিকে চেয়ে দেখলে—তারপরে সেও উঠে গিয়ে এ্যালিসের পাশে বসলো।আহত মেয়ে-সৈনিকের হাতের নাড়ী দেখে বললে—এ শেষ হয়ে গিয়েছে। এঃ, এই দ্যাখো গলায় লেগেছে গুলি—তোমার কাপড় যে রক্তে ভেসে গেল।

এ্যালিস্কে এক রকম জোর করে টেনে বিমল তাকে আবার উপুড় করে শোয়ালে। বিমল ভাবছিল, এখুনি যদি দুর্দান্ত জাপানী গ্রিনেডিয়াররা হ্যান্ডগ্রিনেড নিয়ে ছুটে আসে টিবিটা ডিঙিয়ে, তবে এই শায়িতা নারী-সৈনিকের দল একটাও টিকবে না। জাপানী হ্যান্ডগ্রিনেডের বিস্ফোরণের ফল অতি সাংঘাতিক, এদের কম্যান্ডান্ট কি ভরসায় এদের এখনো শুইয়ে রেখেছে? মরবে তো সবগুলোই মরবে? যা করেকরুক, ওদের সৈন্য ওরা বাঁচাতে হয় বাঁচাক, নয়তো যা হয় করুক। কিন্তু মিনি ও এ্যালিসের জীবন আবার বিপন্ন হোল।

ফটাফট ফটাফট—

আবার একটা অস্ফুট শব্দ। তারপর বিমল চেয়ে দেখলে, চীৎকার না করেও সারির মাঝামাঝি দুটি মেয়ে উপুড় অবস্থাতেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। হাতের শিথিল মুঠিতে তখনও রাইফেল ধরাই রয়েছে। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ থেকে রক্ত বার হয়ে সামনের মাটি রাঙা হয়ে গিয়েছে। আর একটি মেয়েও দেখতে দেখতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। আঃ—কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড! পুরুষদের এরকম অবস্থায় দেখলে সহ্য করা হয় তো যায়—কিন্তু এই ধরণের নারীবলির দৃশ্যটা বিমলের কাছে অতি করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠলো।

বিমল বজ্জে—এ্যালিস্, কম্যান্ডান্টটি কেমন লোক? এদের দাঁড়িয়ে খুন করাচ্ছে কেন? হঠে যাবার অর্ডার নাদেওয়ার মানে কি? জাপানীরা বেওনেট কি হ্যান্ডগ্রিনেড চার্জ করলে একজনও বাঁচবে?

এ্যালিস্ বিমলের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে—তার ওদিকে মিনি।

মিনি বজ্জে—কম্যান্ডান্টের এ-রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোনো মানে আছে।

মানে কি আছে তা জানবার আগেই আরও দুটি মেয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল—এদের এই নিঃশব্দ মৃত্যু বিমলের কাছে বড় মর্মান্বস্পর্শী বলে মনে হলো। হঠাৎ একটা লম্বা কাশীর পেয়ারার আকারে বস্ত্র শায়িতা মেয়েদের সারির অদূরে এসে পড়লো—বিমল ও এ্যালিস্ দুজনেই বলে উঠলো—গ্রিনেড!

কিন্তু হ্যান্ডগ্রিনেডটা ফাটলো না। বোধ হয় এবার জাপানীরা চার্জ করবে। এ্যালিস্ ও মিনির জন্যে বিমল শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময় কম্যান্ডান্ট ওদের হঠাৎ অর্ডার দিলে।

পেছনের সারি শুয়ে-শুয়েই পিছুদিকে হঠতে লাগলো। সামনের সারিগুলো ততক্ষণ রাইফেল বাগিয়ে তাদের রক্ষা করছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামনের সারিও হঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা চার্জ করলে। দলে দলে ওরা টিবিটা পেরিয়ে ‘ভুবানজাই’ বলে ভীষণ বাজখাঁই চীৎকার করতে করতে ছুটে এল—এদিকে নারীবাহিনীর সব বন্দুকগুলো একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো। এখানে ওখানে জাপানী সৈন্য ধূপ-ধাপ করে মুখ খুবড়ে পড়তে লাগলো। তবুও ওদের দল এগিয়ে আসছে।

সব পেছনের সারি উঠে দাঁড়িয়ে একযোগে সাত আটটা হ্যান্ডগ্রিনেড ছুঁড়লো, চার পাঁচটা ফাটলো। আরও কতকগুলো জাপানী সৈন্য মাটিতে পড়ে গেল। তিন জন মাত্র জাপানী এদের দলের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে দুজন বেওনেটের ঘায়ে সাংঘাতিক আহত হোল—বাকী একজনের মাথায় গুলি লেগে সাবাড় হোল।

ততক্ষণ নারী-বাহিনী প্রায় একশো দেড়শো গজ দূরে চলে গিয়েছে। এতদূর থেকে হ্যান্ডগ্রিনেড কোনো কাজ আসবে না—কেবল কার্যকরী হতে পারে মিল্‌স বম্ব জাতীয় বোমা। সে কোনো দলের কাছেই নেই, বেশ বোঝা গেল।

কম্যান্ডান্ট বিমলকে ডেকে বজ্জন—এরকম কেন করেছি, আপনি বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। এর কিছু দূরে মিং-চাউ-এর রেল স্টেশন। দুটো সৈন্যবাহী ট্রেন পর পর চলে যাবার কথা। জাপানীরা রেল স্টেশন আক্রমণ করতো। আমি ওদের বাধা দিয়ে এখানে আটকে রাখলাম। টাইম অনুসারে ট্রেন দুটো চলে গিয়েছে। এখন আর আমার সৈন্যদের মৃত্যুর সম্মুখীন করা অনাবশ্যিক। জাপানীরাও তা বুঝেছে, ওরাও আর আসবে না। ওদের লক্ষ্যস্থল আমরা নই—সেই ট্রেন দুখানা।

—কিন্তু এরোপ্লেন যদি বোমা ফেলে?

—আমার ঘাঁটি পার করে দিলাম নিরাপদে—তারপর অন্য এলাকার লোক গিয়ে বুঝুক সে কথা।

মিং-চাউয়ের রেল স্টেশনে পৌঁছে সবাই খাওয়া-দাওয়া করবার হুকুম পেলে। বিমল ব্যস্ত হয়ে পড়লো মিনি ও এ্যালিসকে কিছু খাওয়াতে। খাবার কিছুই নেই। অন্ততঃ সভ্য খাদ্য কিছু নেই। কম্যান্ডান্টকে বলে কিছু চাল যোগাড় করে একটা গাছতলায় এ্যালিস একটা পুরোনো সস্প্যানে ভাত চাপিয়ে দিলে তিনজনের মতো।

বেলা প্রায় বারোটা। রৌদ্র বেশ প্রখর, কিন্তু গরম নেই, বেশ শীত।

ভাত প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় দলে দলে ছোট্ট শীর্ণকায় ছেলেমেয়ে গাছতলায় নীরবে এসে দাঁড়ালো। তারা ক্ষুধার্তের ব্যগ্র দৃষ্টিতে সস্প্যানের দিকে চেয়ে রইল। জনৈক মেয়ে সৈনিক বন্ধে—এরা আশপাশের গ্রামের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ছেলেমেয়ে; আমাদের দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে, ওরা খাবার লোভে এসেছে।

এ্যালিস বন্ধে—পুওর লিটল ডিয়ারস!...ওদের কি খেতে দিই, বিমল?

বিমল মুশকিলে পড়ে গেল। নিজের খাওয়ার জন্যে নয়—মিনি এবং এ্যালিস কতদিন পেটভরে খায়নি বলেই ওদের খাওয়াতে ব্যগ্র ছিল। নিজে না হয় না খাবে, কিন্তু এ্যালিস যেমন মেয়ে, নিজের মুখের ভাত সব এফুনি তুলে দেবে এখন এদের।

সুখের বিষয় একটা সমাধান হোল। ওরা চীনা ছেলে-মেয়ে, চীনা খাবার খেতে আপত্তি নেই। অন্য অন্য মেয়ে-সৈনিকরা ওদের দেশীয় খাদ্য কিছু কিছু দিলে। তারা চলে গেল তাই খেয়ে। এ্যালিসের ইচ্ছে, ওদের মধ্যে একটা ছোট্ট ছেলে নিয়ে যায়। বন্ধে—বিমল, বলো না ওদের মধ্যে কাউকে আমার সঙ্গে যাবে। আমি খুব যত্ন করবো। বিমল হাসলে, তা কি কখনো হয়?

একটু পরে একখানা ট্রেন এল। তাতে সব খোলা ট্রাক, কয়লার গাড়ীর মতো। কম্যান্ডান্টের আদেশে সবাই তাতে উঠে পড়লো। ট্রেনের গার্ডের মুখে শোনা গেল জাপানীরা এখন থেকে বাইশ মাইল ডাউন লাইনে একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন এরোপ্লেন থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

ট্রেন ছাড়লো। গার্ড বন্ধে—ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা। ওরা প্রত্যেক সৈন্যবাহী ট্রেনের ওপর কড়া লক্ষ্য রেখেছে। পৌঁছে দিতে পারবে কিনা নিরাপদে তার ঠিক নেই।

মাইল ত্রিশের দুধারে ফাঁকা মাঠ, ধানের ক্ষেত, গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলল। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে, রোদ নেই। মাঠে ঘন ছায়া পড়ে এসেছে। এমন সময় একটা পরিচিত আওয়াজ শুনে বিমলের বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠলো। মুখ উঁচু করে দেখতে গিয়ে দেখলে ট্রেনের সবাই মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। অনেকগুলি এরোপ্লেনের সম্মিলিত ঘরঘর আওয়াজ। ট্রেন যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে জোরে চলতে লাগলো।

মিনি বন্ধে—ওই দেখো বিমল এরোপ্লেনের সারি! বম্বার!—

চক্ষের নিমেষে এরোপ্লেনের সারি নিকটবর্তী হোল—কিন্তু ট্রেনখানাকে গ্রাহ্য না করেই যেন এরোপ্লেনগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ একখানা বম্বার দল ছেড়ে বেশ নীচু হয়ে এলো। ট্রেনের সকলের মুখ শুকিয়েছিল আগেই—এখন যেন বুকের রক্ত পর্যন্ত জমে গেল। এই ফাঁকা মাঠে বোমা ফেললে ট্রেনের চিহ্ন খুঁজে মিলবে না। তার ওপরে ছাদ-খোলা ট্রাক গাড়ী বোঝাই সৈন্য, কারও মৃতদেহ এর পর সনাক্ত পর্যন্ত করা যাবে না। এ্যালিস ও মিনিকে বাঁচানো গেল না শেষে।

এরোপ্লেনখানা নীচে নেমে ছোঁ-মারা চিলের মতো একটা বোমা ফেলেই তখনি ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ। সমস্ত ট্রেনখানা কেঁপে নড়ে উঠলো যেন, কিন্তু ট্রেনের বেগ কমলো না। বিমল চেয়ে দেখলে রেললাইন থেকে দশ গজ দূরে একটা জায়গায় বিশাল গর্তের সৃষ্টি করে মাটি, ধুলো, ঘাস, বালি অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ হাত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে কালো ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে বোমাটা সমাধিলাভ করেছে। বোমারু তাগ্ ঠিক করতেপারে নি।

আর মাইল পাঁচ ছয় পরে একটা রেলস্টেশন। গাড়ীখানা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পূর্বেই দেখা গেল স্টেশন থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে—লোকজন ছোট্টাছুটি করছে—একটা হট্টগোল, কলরব, ব্যস্ততার ভাব। ট্রেনখানা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াতেই বোঝা গেল জাপানী বিমান থেকে বোমা ফেলে স্টেশনটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। টিনের ছাদ দুমুড়ে বেঁকে ছিটকে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে, একপাশে আগুন লেগে গিয়েছে—গোটা প্ল্যাটফর্মে মানুষের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ, কারো হাত, কারো পা, কারো মুণ্ড।

নিকটে একটা গ্রাম। গ্রামের চিহ্ন রাখেনি বোমারুর দল। ইনসেনডিয়ারি বোমা ফেলে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ট্রেন থেকে সবাই নেমে সাহায্য করতে ছুটলো। গ্রামের লোক বেশী মরে নি—তবুও বিমল দেখলে গ্রামের পথে চার-পাঁচটা বীভৎস মৃতদেহ পড়ে আছে। এরোপ্লেনগুলোর চিহ্ন নেই আকাশে, তাদের কাজ শেষ করে তারা চলে গিয়েছে। গ্রামের নরনারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে পালিয়েছিল, যদিও বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেখানেই সর্বাপেক্ষা বেশী। একটি মেয়ে একটা ভাঙা ঘরের সামনে ভাঙাচোরা হাঁড়িকুড়ি বেতের পেটরা কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে আর কাঁদছে। একজন মেয়ে-সৈন্য তার কাছে গিয়ে চীনাভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে। বিমলের দল গ্রামের অন্য অন্য লোকজনের সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

একটু পরেই সেখানে ভারী একটি অদ্ভুত দৃশ্য সবারই চোখে পড়লো।

গ্রামের পাশে একটা ছোট মাঠ—তারই এক গাছতলায় জনৈক বৃদ্ধ গ্রামের লোকজনকে চারিপাশে নিয়ে কি বলছেন বক্তৃতার ধরনে। বিমল চিনলে—প্রোফেসর লি!

এ্যালিস্ সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—ড্যাডি! চিনতে পারো?

সৌম্যমূর্তি শ্বেতশশ্রু বৃদ্ধ বক্তৃতা থামিয়ে একগাল হেসে ওর দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বল্লে—তোমরা কোথা থেকে?

এ্যালিস্ হেসে বল্লে—এই ট্রেনে নামলাম। আর একটু হোলে আমাদের কাউকে দেখতে পেতে না—আমাদের ট্রেনেও বোমা পড়েছিল।

বিমল বল্লে—গুডমর্নিং, প্রোফেসর লি। আপনার দলবল কোথায়? আপনি কি করছেন এখানে?

বৃদ্ধ বল্লে—দলবল এখান থেকে তিনমাইল দূরে আর একখানা বোমায় বিধ্বস্ত গ্রামে সাহায্য করছে। আমি এদের উপদেশ দিচ্ছি এরোপ্লেন বোমা ফেলতে এলে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়। এরা কিছুই জানে না—দাঁড়িয়ে মরছে, নইলে দেখ গ্রামের অধিকাংশ লোক ফাঁকা মাঠে ছুটে পালায়?

—আপনাকে তো সর্বত্রই দেখি, প্রোফেসর লি! পরের সাহায্য করতে এমন আর ক'জন লোক চীনদেশে আছেন জানি না। আপনাকে দেখে আপনার দেশের ওপর ভক্তি আমার অনেক বেড়ে গেল।

প্রোফেসর লি হেসে বল্লে—আমার দেশ অতি হতভাগ্য, আমরা অতি প্রাচীন সভ্য জাতি কিন্তু জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছি। ভগবান নদীর এক কূল ভাঙেন আর এক কূল গড়েন। জাপান আজ উঠছে—আবার আমাদের দিন আসবে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, যে ক'দিন বাঁচি, মূঢ়তা ও বর্বরতার দ্বারা অত্যাচারিত দেশের সেবা করে দিন কাটিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমার দ্বারা আর কতটুকু উপকারই বা হবে?

বিমল বল্লে—বড় ইচ্ছে হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথা অনুসারে আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আপনি কি অনুমতি করবেন? বৃদ্ধ মহাচীন যেন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন আপনার মূর্তিতে।

বিমলের দেখাদেখি মিনি, এ্যালিস্ এবং আরও কয়েকটি মেয়ে-সৈনিক বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে হাসিমুখে।

ট্রেন ছইস্ল দিলে। কম্যান্ড্যান্টের হুকুম শোনা গেল—ট্রেনে গিয়ে উঠে পড়।

এ্যালিস্ বল্লে—ড্যাডি, তোমার সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে? আমরা দুটি মেয়ে এবং আমার এই ভারতবর্ষীয় বন্ধুটি তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাই—অনুমতি দেবে ড্যাডি?

বৃদ্ধ বললেন—এখন তোমরা যাও খুকীরা—শীগীর আমার সঙ্গে দেখা হবে। এ কাজ তোমাদের নয়।

ট্রেন আবার চললো।

দুধারে শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে খোঁয়ায় কালো অগ্নিদগ্ধ গ্রাম। জাপানী বোমারু বিমানের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।

এ্যালিস্ বল্লে—বিমল, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? প্রোফেসর লি-কে আবার আমাদের মধ্যে পেতে। এত ভাল লেগেছে ওঁকে। আমার নিজের বাবা নেই, ওঁকে দেখে সেই বাবার কথা মনে আসে।

বিমল দেখলে এ্যালিসের বড় বড় চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

মিনি বল্লে—আমারও বড় ভক্তি হয় সত্যি। ভারি চমৎকার লোক।

বিমল বললে—অথচ কি ভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ, তা জানো? আমি যখন প্রথম চীনদেশে আসি—আজ প্রায় একবছর আগের কথা—তখন হ্যাং-চাউ রেলস্টেশনে উনি ওঁর ছাত্রদল নিয়ে উঠলেন—বল্লেন, যুদ্ধের সময় ওখানকার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন। শুনে আমার হাসি পেয়েছিল।

এ্যালিস্ বললে—তখন কি জানতে উনি একজন মহাপুরুষ লোক! উনি যুদ্ধ-উপক্রম অঞ্চলের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন এটা ঠিকই—কিন্তু পরের দুঃখ দেখে সে সব ওঁর ভেসে গেল। People such as these are the salts of the Earth—নয় কি?

বিমল মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

একটি নদীর পুল বোমায় ভেঙে দিয়েছে। আর ট্রেন যাবার উপায় নেই। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীরা দিনরাত খাটছে যদি পুলটা কোনোরকমে মেরামত করে কাজ চালানো যায়।

কাছেই একটা তাঁবু। মাঠের মধ্যে কিছুদূরে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। এটা ফিল্ড হাসপাতাল।

ট্রেন থেকে মেয়ে-সৈন্যদের পথেই নামিয়ে দেওয়া হোল। ট্রেনখানা যেখান থেকে এসেছিলসেখানে ফিরে যাবে বলে পিছু হটে চলে গেল। কোনো বড় স্টেশনে গিয়ে এঞ্জিনখানা সোজা করে জুড়ে নেবে।

সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। যেন অনেকটা পূর্ববঙ্গের বড় বড় জলা অঞ্চলের মতো। ফসলের ক্ষেত নেই—সামনে একটা বিল কিংবা ঐ ধরনের জলাশয়—দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাসের বন জলের ধারে। দূরে দূরে মেঘের মতো নীল পাহাড়। জায়গাটার নাম সিং-চাং। বিমল নেমে চারিদিক দেখে অবাক হয়ে গেল।

ট্রেনে করে এতদূরে এসে এখানে আবার যুদ্ধক্ষেত্র কি করে এল।

বিমলের ধারণা ছিল জাপানীদের আসল ঘাঁটি কোন্‌কালে পার হয়ে আসা গিয়েছে।

কিন্তু কম্যান্ডান্ট তাকে বুঝিয়ে বল্লেন, এখান থেকে আরও প্রায় পঁচিশ মাইল দূর হ্যাং-চাউ শহর পর্যন্ত ওদের সৈন্যরেখা বিস্তৃত। সমুদ্রের উপকূলভাগে অনেক দূর অবধি ওরা নিজেদের লাইন ছড়িয়ে রেখেছে। মাটিতে একটা নক্সা ঐকে বুঝিয়েও দিলেন।

বিমল একটা অনুচ্চ টিবির ওপর উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

কিছুদূরে একটা গ্রাম—পাশে কাদের অনেকগুলো ছোট বড় তাঁবু—সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধ হয় রান্নাবান্না চলেছে। পশ্চিম দিকে একটা বড় শস্যক্ষেত্র, তার ধারে লম্বা লম্বা কি গাছের সারি। মোটের ওপর সবটা নিয়ে বেশ শান্তিপূর্ণ পল্লীদৃশ্য।

এ কি ধরনের যুদ্ধক্ষেত্র?

কিন্তু বিমলদের সেখানে উপস্থিত হবার আধঘণ্টার মধ্যে পাঁচ-ছ'জন আহত সৈন্যকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতাল তাঁবুতে আনা হোল। সকলেই রাইফেলের গুলিতে আহত।

বিমল জিজ্ঞেস করে জানল, যুদ্ধক্ষেত্র যে বেশীদূর তাও নয়—ওই গাছের সারির পাশেই, এখান থেকে আধমাইলের মধ্যে। একটা ক্ষুদ্র গ্রাম জাপানীরা দখল করে সেখানে ঘাঁটি করেছে—চীনা সৈন্য ওদের সেখান থেকে তাড়বার চেষ্টা করছে।

কম্যান্ডান্টের আদেশে মেয়ে-সৈনিকরা রান্নাবান্না করে খাবার আয়োজন করতে লাগলো—কারণ অনেকক্ষণ তারা বিশেষ কিছু খায়নি। বিমল বললে—খাইয়ে নিয়ে এদের কি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে? কম্যান্ডান্ট বললে—না, এরা পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ হয় না—ওদের অন্ততঃ দশঘণ্টা বিশ্রাম করতে দেবো।

—তারপর?

—তারপর যুদ্ধে পাঠাতে পারি—রিজার্ভ রাখতে পারি। এখান থেকে সাত মাইল দূরে হ্যানকাউ-ক্যান্টন রেলের ধারে একটা গ্রামে নাইন্থ-রুট আর্মির এক ঘাঁটি। সেখানে জেনারেল মাও-সি-তুং আছেন—তাঁর হুকুমমতো কাজ হবে।

—হুকুম আসবে কি করে?

—ঘোড়ার পিঠে যায় আসে ডেস্প্যাচ দল। আমাদের ফিল্ড টেলিফোন নেই।

কম্যান্ড্যান্টের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বিমল হাসপাতাল তাঁবুতে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার কাজে মন দিল। তিনটি হতভাগ্য সৈনিক কোনোপ্রকার সাহায্য পাবার পূর্বেই মারা গেল। বাকী কয়েকজনের করুণ আর্ন্তনাদে হাসপাতাল মুখরিত হয়ে উঠলো। কি নির্ধুর ও পৈশাচিক ব্যাপার এই যুদ্ধ! এ কথা বিমলের মনে না এসে পারলো না।

এ্যালিস্ এসে বল্লে—এদের জন্যে বৃথা চেপ্টা। এদের একজনও বাঁচবে না।

বিমল বল্লে—তাই মনে হয়। না আছে ওষুধ, না আছে যন্ত্রপাতি, কি দিয়ে চিকিৎসা করবো?

—বিমল, এদের জন্যে আমেরিকান রেডক্রসে লিখে কিছু জিনিস আনার চেপ্টা করবো?

—লেখো না। নইলে সত্যি বলছি আমাদের খাটুনি বৃথা হবে।

—ঠিকই তো। এটা কি একটা হাসপাতাল? কি ছাই আছে এখানে?

—মিনি কোথায় গেল?

—সে রাঁধছে। খেতে হবে তো? রাঁধবার কোনো বন্দোবস্ত নেই। দুটি চাল ছাড়া আর কিছু দেয় নি।

—টিনবন্দী খাবার কিছু সাংহাই থেকে আনিয় নিই। ও খেয়ে তোমরা বাঁচবে না।

—একটা কথা শোনো। তুমি একবার সাংহাই যাও—মিনি সুরেশ্বর সম্বন্ধে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে আমায় বলছিল। ও আমায় কাল থেকে বলচে তোমায় বলতে।

—আমিও যে তা না ভেবেছি এমন নয়। কিন্তু সাংহাই পর্যন্ত কোনো ট্রেন এখান থেকে যাচ্ছে না তো! আচ্ছা কম্যান্ড্যান্টকে বলে দেখি।

আবার চারজন আহত সৈনিককে স্ট্রেচারে করে আনা হোল। একজনের মাথার খুলির অর্ধেকটা উড়ে গিয়েছে বল্লেই হয়। বিমল বল্লে—এ তো গেল! একে এখানে কেন এনেছে?

কিন্তু অদ্ভুত জীবনীশক্তি চীনা সৈনিকটির। মাথার ব্যান্ডেজ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দুবার ব্যান্ডেজ বদলাতে হোল, তবুও সৈনিকটি মারা গেল না—বিমল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে।

একজন সৈনিক ডেস্প্যাচ রাইডার হাসপাতালে ঢুকে বল্লে—আমাদের তাঁবু ওঠাতে হবে এখান থেকে—শত্রু খুব নিকটে এসে পড়েছে। রেললাইনের ওপর ওদের লক্ষ্য কিনা! রেল লাইনটি দখল করবে। আমাদের সৈন্য প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু আজ সারাদিনে জাপানীরা প্রায় একমাইল এগিয়েছে। দেখবে এসো।

তারপরে সৈনিকটি একটা ফিল্ড গ্লাস বার করে বিমলের হাতে দিয়ে বল্লে—পূর্বদিকে ওই যে গাঁ-খানা দেখা যাচ্ছে, ওদিকে চেয়ে দেখ—বিমল একখানা গ্রাম বেশ স্পষ্ট দেখছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু না। সৈনিকটি বল্লে—ওই গ্রামখানির পেছনেই শত্রুর লাইন। গ্রামখানা দখল করতে ওরা আজ কদিন চেপ্টা করছে—ওখানেই আমরা বাধা দিচ্ছিলাম। আজ গ্রামের অর্ধেকটা দখল করেছে। সুতরাং বোধ হয় কাল কি পরশু রেললাইনে এসে পৌঁছবে।

—গ্রামে লোকজন আছে?

—পাগল! কবে পালিয়েছে। পশ্চিমদিকে একটা নদী আছে—তার ওপারে পলাতক গৃহহারাাদের একটা বস্তি বসে গেছে। আট-দশখানা গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে ওখানে।

—খাবার দিচ্ছে কে?

কে দেবে? অনাহারে অনেকে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুর্দশা দেখলে বুঝবে, বর্তমান কালের যুদ্ধ কি নির্ধুর ব্যাপার!

বিমল কথায় কথায় জানতে পারলে, ডেস্প্যাচ রাইডার সৈনিকটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান— পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—পূর্বে স্কুলমাস্টারি করতো, যুদ্ধ বাধার পর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে।

বিমল বল্লে—তুমি আমাকে ওই গ্রামে নিয়ে চলো না?

—এমনিই তো যেতে হবে। বোধহয় ওখানেই হাসপাতাল উঠে যাবে—কারণ শত্রুর লাইন থেকে জায়গাটা দূরে।

—এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে বারণ করেছে কে?

—কেউ না। সে তো সর্বত্রই ফেলছে। তবে একটা পাইনবনের তলায় এ বস্তি—জাপানী প্লেন হঠাৎ সন্ধান পাবে না। ভয়ে ওরা রান্না করে না—পাছে ধোঁয়া দেখে বোমারু প্লেন সন্ধান পায়।

সৈনিকটি চলে গেলে বিমল এ্যালিস্কে ডেকে কথাটা বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্রেনের শব্দ শোনা গেল দূরে।

এ্যালিস্ তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে এসে বজ্জে—ট্রেন আসছে, না এরোপ্লেন?

বিমল বজ্জে—ট্রেনই। বোধহয় আরও সৈন্য আসছে। চল দেখি গিয়ে। অনেকে রেললাইনের ধারে জড়ো হোল। এখানে স্টেশন নেই। একজন লোক নিশান হাতে অপেক্ষা করছিল—নিশান দেখিয়ে ট্রেন দাঁড় করাবে। ট্রেন এসে পড়লো। সারি সারি খোলা মাল-গাড়ীতে সৈন্য বোঝাই—অন্য সাধারণ যাত্রীও আছে। কতকগুলো ছাদ-আঁটা মাল-গাড়ী পেছনের দিকে—তাতে সৈন্যদের রসদ বোঝাই।

গাড়ী থেকে দলে দলে সৈন্য নামতে লাগলো। জাপানী সৈন্যদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা করবার জন্যে এরা আসছে ক্যান্টন থেকে। রসদ বোঝাই মালগাড়ীগুলো থেকে রসদ নামানোর ব্যবস্থা করা হতে লাগলো—কারণ বেশীক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে এখুনি কোনদিক থেকে জাপানী বিমান আকাশপথে দেখা দেবে হয়তো। হঠাৎ এ্যালিস্ উত্তেজিত সুরে বজ্জে—বিমল, বিমল—ওকে? প্রোফেসর লি না?

তারপরেই সে হাসিমুখে সামনের দিকে ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল—ড্যাডি—ড্যাডি—

সত্যিই তো—হাস্যমুখে বৃদ্ধ একটা বড় ক্যান্সিসের ব্যাগ হাতে ভিড় ঠেলে বাইরে আসতে চেষ্টা করছেন।

বিমল এগিয়ে গিয়ে বজ্জে—নমস্কার প্রোফেসর লি—ব্যাগটা আমার হাতে দিন। আপনি কোথা থেকে?

এ্যালিস্ ততক্ষণে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে? বৃদ্ধ তাঁর কাঁধে সম্মেহে হাত রেখে বিমলের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বজ্জন—তোমরা এখানে আছ? বেশ বেশ। আমি এসেছি পলাতক গ্রামবাসীদের যে বস্তি আছে নদীর ওপারে—সেখানে কয়েক পিপে আপেল বিলি করতে। আমেরিকান জুনিয়র রেডক্রস দুশো পিপে ভাল ক্যালিফোর্নিয়ার আপেল পাঠিয়েছে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের খাওয়ানোর জন্যে। আমার ঠিকানাতেই পাঠিয়েছিল। আর সব বিলি করে দিয়েছি অন্য স্থানে—দশ পিপে মজুত আছে এখনও। তা তোমরা আছ ভালই হয়েছে—তোমরা সাহায্য করো এখন।

এ্যালিস্ তো বেজায় খুশী। বজ্জে—ড্যাডি, খুব ভাল কথা। তা বাদে আরও অনেক কাজ হবে যখন তুমি এসে পড়েছো। চলো, আপেলের পিপে সব নামিয়ে নিই।

এমন সময় মিনি ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে ছুটে এসে ব্যস্তভাবে বজ্জে—শীগ্গির এসো বিমল, শীগ্গির এসো এ্যালিস্—সুরেশ্বর নামছে ওই দেখ ট্রেন থেকে—

সুরেশ্বর সত্যিই নামছে বটে—তার সঙ্গে দুজন চীনা ডাক্তার, এদেরও বিমল চেনে—সাংহাই চীনা রেডক্রস হাসপাতালে এরা ছিল।

বিমল বজ্জে—প্রোফেসর লি—একটু আমায় ক্ষমা করুন, পাঁচমিনিটের জন্যে আসছি।

সুরেশ্বর তো ওদের দেখে অবাক। বজ্জে—তোমরা এখানে! মিনি আর এ্যালিস্ই বা এখানে কি করে এল! সাংহাইতে বেজায় গুজব এদের চীনা গুপ্তারা গুম করেছে—আর বিমল তুমি জাপানীদের হাতে বন্দী। মিনি কেমন আছে?

বিমল বজ্জে—সে-সব কথা হবে এখন। চলো এখন সবাই মিলে তাঁবুতে গিয়ে বসা যাক। অনেক কথা আছে। প্রোফেসর লি'কে ডেকে আনি—উনিও আমাদের সঙ্গে আসুন। তোমরা এগিয়ে চলো ততক্ষণ। আমি ওঁর আপেলের পিপেগুলো নামাবার কি ব্যবস্থা হোল দেখে আসি।

কিছুক্ষণ পরে দুঃস্থ চীনা নরনারীদের তাঁবুতে সুরেশ্বর, বিমল, এ্যালিস্ ও মিনি আপেল বিলি কাজে প্রফেসর লি'কে সাহায্য করছিল। এ জায়গা ঠিক তাঁবু নয়, একটা পাইন বন, তার মাঝে মাঝে পুরোনো কেম্বিস, চট, মাদুর, ভাঙা টিন প্রভৃতি জোড়াতালি দিয়ে আশ্রয় বানিয়ে তারই মধ্যে হতভাগ্য গৃহহারার দল মাথা গুঁজে আছে। ওদের দুর্দর্শা দেখে বিমলের কঠিন মনেও দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হোল। ছোট ছোট উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত, কাদামাটি মাথা শিশুদের ব্যগ্র প্রসারিত হাতে আপেল বিলি করবার সময় এ্যালিসের চোখ দিয়ে জল

পড়তে দেখলেবিমল। নাঃ—বড় ছেলেমানুষ এই এ্যালিস্! এ্যালিসের প্রতি একটা কেমন অকারণ স্নেহে ও মমতায় বিমলের মন গলে যায়। কি সুন্দর মেয়ে এ্যালিস্ আর কি ছেলেমানুষ!

হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। আপেল বিলি করতে করতে প্রোফেসর লি এক সময় একটা আপেলের পিপের মধ্যে ঘাড় নীচু করে দেখে বল্লেন—চারটে আপেল আর বাকী আছে। আমি ক্যালিফোর্নিয়ার আপেল কখনো খাইনি—একটি আমি খাবো।

বলেই সদানন্দ বৃদ্ধ বালকের মতো আনন্দে একটা আপেল তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। বিমল অবাক, সে যেন একটা স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলে। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তার মাথা লুটিয়ে পড়তে চাইল বৃদ্ধের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরনের ভালবাসা এসে তার মনে উপস্থিত হোল বৃদ্ধের প্রতি। এঁকে ছেড়ে আর সে থাকতে পারবে না—অসম্ভব! যেমন সে আর এ্যালিসকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারবে না। চীনদেশে তার আসা সার্থক হয়েছে এই দুজনের সাক্ষাৎ পেয়ে। এই যুদ্ধের বর্বরতা, হত্যা, বোমাবর্ষণ, রক্তপাত, অনাহার, দারিদ্র্য, এই চারিদিকের বীভৎস নরবলির হৃদয়হীন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রোফেসর লি আর এ্যালিস্ (অবশ্য মিনিও আছে)—এদের আবির্ভাব দেবতার আবির্ভাবের মতোই অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর।

এ্যালিস্ ও মিনি ছুটে গেল ছেলেমানুষের মতো।

—ড্যাডি ড্যাডি, আমাদের একটা আপেল দেবে না?...

বৃদ্ধ হাসিমুখে বল্লেন—মেয়েদের না দিয়ে কি বুড়ো বাবা খায়? দুটি রেখে দিয়েছি তোমাদের দুজনের জন্যে—আর একটা বাকী আছে, কে নেবে?

বিমল বল্লে—সুরেশ্বর নাও।

সুরেশ্বর বল্লে—বিমল তুমি নাও, আমি আপেল খাই না।

এ্যালিস্ বল্লে—খাও সুরেশ্বর, আমি আমার আধখানা বিমলকে দিচ্ছি।

মিনি বল্লে—তা নয়, বিমল খাও, আমি আধখানা সুরেশ্বরকে দেবো।

প্রোফেসর লি মীমাংসা করে দিলেন—একটা আপেল ভাগাভাগি করে খাবে বিমল ও সুরেশ্বর। মেয়েরা আস্ত আপেল খাবে। তাঁর কথার ওপর আর কেউ কথা বলতে সাহস করলে না।

সেই সৈনিক ডেসপ্যাচ-রাইডারটি এসে খবর দিলে, হাসপাতাল তাঁবু এখানেই উঠে আসছে—পাইনবনের মাঝখানে। সামনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কম্যান্ডান্ট খবর পাঠিয়েছেন। ডেসপ্যাচ রাইডার আরও এক সংবাদ দিলে—আজ সকালে জাপানীদের হ্যান্ডগ্রিনেড চার্জে নারীবাহিনীর সতেরোটি তরুণী একদম মারা পড়েছে। একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দেহ—হাত, পা, মুণ্ড, আঙুল ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে।

মিনি শিউরে উঠে বল্লে—ও হাউ সিম্পলি ড্রেডফুল!

কেন জানি না এই দুঃসংবাদে বিমলের মন এ্যালিসের প্রতি মমতায় ভরে উঠলো। এ্যালিসের মতোই উদার, নিঃস্বার্থ সতেরোটি তরুণী—কত গৃহ অন্ধকার করে, কত বাপমায়ের হৃদয় শূন্য করে চলে গেল!—মানুষ মানুষের ওপর কেন এমন নিষ্ঠুর হয়?

হঠাৎ পলাতকদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত শোরগোল উঠলো। সবাই ছুটছে, গাছের তলায় গুঁড়ি মেরে বসছে, ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে—একটা হুড়োহুড়ি, এ ওকে ঠেলছে, দু'একজন উর্দ্ধশ্বাসে খোলা মাঠের দিকে ছুটছে।

ডেসপ্যাচ রাইডার সৈনিক যুবকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্লে—নীচু হয়ে বসে পড়ুন—সবাই শুয়ে পড়ুন—জাপানী বম্বার!

আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশই স্পষ্ট হয়ে উঠলো...বিমল চোখ তুলে দেখলে পাইনবনের মাথার ওপর আকাশে দুখানা কাওয়াসাকি বম্বার...নিজের অজ্ঞাতসারে সে তখনি এ্যালিসের হাত ধরে তাকে একটা গাছের তলায় নিয়ে দাঁড় করালে।

—প্রোফেসর লি—প্রোফেসর লি—এদিকে আসুন—

ভীষণ একটা আওয়াজ...বিদ্যুতের মতো আলোর চমক...খোঁয়া, মাটি...পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো ভূমিকম্পের মতো...সবারই কানে তলা...চোখে অন্ধকার...জাপানী বম্বার বোমা ফেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আর্ন্তনাদকান্না...গোঙানি...নারীকণ্ঠের ভয়ান্ত চীৎকার।

আবার একটা...বিমলের মনে হোল পৃথিবীর প্রলয় সমাগত, পৃথিবী দুলছে আকাশ দুলছে...কেউ বাঁচবে না, মিনি, এ্যালিস্, সে, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি সবাই এই প্রলয়ের অনলেধ্বংস হবে।

তারপর ক'টা বোমা পড়লো এরোপ্লেন থেকে—তা আর গুনে নেওয়া সম্ভব হোল না বিমলের পক্ষে। বিস্ফোরণের আওয়াজ ও মনুষ্য-কণ্ঠের আর্ন্তনাদের একটা একটানা শব্দপ্রবাহ তার মস্তিষ্কের মধ্যে বয়ে চলেছে—একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করে নেওয়া শক্ত।

তারপর হঠাৎ যখন সব থেমে গেল, এরোপ্লেন চলে গিয়েছে—যখন বিমল আবার সহজ বুদ্ধি ফিরে পেল—তখন দেখলে এ্যালিসের একখানা হাত শক্ত করে তার নিজের মুঠোর মধ্যে ধরা—মিনি, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি, সকলে মাটিতে শুয়ে—হয়তো সবাই মারা গিয়েছে—সে-ই একমাত্র রয়েছে বেঁচে।

প্রথমে মাটি থেকে ঝেড়ে উঠলো এ্যালিস্। তারপর প্রোফেসর লি, তারপর সুরেশ্বর।—মিনি মূর্ছা গিয়েছে—অনেক কষ্টে তার চৈতন্য-সম্পাদনা করা হোল। হঠাৎ এ্যালিস্ চমকে উঠে আঙুল দিয়ে কি দেখিয়ে প্রায় আর্ন্তনাদ করে উঠলো।

সেই তরুণ ডেসপ্যাচ রাইডারের দেহ অস্বাভাবিকভাবে শায়িত কিছু দূরে। রক্তে আশপাশের মাটি ভেসে গিয়েছে—একখানা হাত উড়ে গিয়েছে—বীভৎস দৃশ্য। সেদিকে চাওয়া যায় না।

কিন্তু দেখা গেল পলাতক গৃহহীন ব্যক্তিদের খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। কয়েকটি ছেলেমেয়ে এবং একটি বৃদ্ধ জখম হয়েছে মাত্র। পাইনবনের পাতার আড়ালে ছিল এরা—ওপর থেকে বোমার লক্ষ্য ঠিকমতো হয়নি।

প্রোফেসর লি'র সঙ্গে এ্যালিস্ ও মিনি আহতদের সাহায্যে অগ্রসর হোল।

সন্ধ্যার পরে একখানা ট্রেন এসে দাঁড়াল। নাইন্থ-রুট আর্মির একটা ব্যাটালিয়ন ট্রেন থেকে নামলো—এরা এসেছে রেলপথ রক্ষা করতে এবং দুটো সাঁকো পাহারা দিতে।

বিমল সুরেশ্বরকে বজ্লে—আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বলতে গেলে একরকম বাস করছি, অথচ লড়াই যে কোন্দিকে হচ্ছে—কি ভাবে হচ্ছে—তা কিছুই জানিনে, চোখেও দেখতে পাচ্ছি নে।

রাত্রে কম্যান্ড্যান্টের সারকুলার বেরুলো—রেললাইনের প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে—আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আক্রমণ করবে—সকলে তৈরী থেকো, যারা সৈন্য নয় যুদ্ধ করছে না—এমন শ্রেণীর লোক দূরে চলে যাও।

রাত প্রায় বারোটা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

সুরেশ্বর বর্ষাতি কোট গায়ে বাইরে থেকে হাসপাতাল তাঁবুতে ঢুকে বজ্লে—আমাদের আয়ু মনে হচ্ছে ফুরিয়ে এসেছে। সারকুলার দেখেছ?

বিমল বজ্লে—গতিক সেই রকমই বটে। জাপানীরা হ্যান্ডগ্রিনেড্ চার্জ করলে কেউ বাঁচবে না।

—আমি ভাবছি মেয়েদের কথা—

—প্রোফেসর লি'কে কথাটা বলা ভাল। উনি কি বলেন দেখি।

প্রোফেসর লি'কে ডাকতে গিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য বিমলের চোখে পড়লো। হাসপাতাল তাঁবুর পাশে একটা ছোট্ট চটে-ছাওয়া তাঁবুতে এ্যালিস্ ও মিনি কি রান্না করছে আঙুনের ওপর—বৃদ্ধ লি ওদের কাছে উনুন ঘেঁষে বসে বুড়ো ঠাকুরদার মতো গল্প করছেন।

এ্যালিস্ বজ্লে—তোমার বন্ধু কোথায় বিমল—খতে হবে না তোমাদের আজ? ড্যাডি আমাদের এখানে খাবেন। উঃ—কি সত্যি কথা, গোলমালে তার মনেই নেই যে সন্ধ্যা থেকে কারো পেটে কিছু যায় নি! বিমল সুরেশ্বরকে ডেকে নিয়ে এল। খাবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু ভাত ও শুকনো সিঙ্গাপুরী কাঁচকলা, চর্বিতে ভাজা।

একজন ডেসপ্যাচ-রাইডার ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাইরে এসে বিমলকে ডাক দিলে। তার হাতে একখানা ছোট্ট সিল-করা খাম।

—আপনি হাসপাতালের ডাক্তার। আপনার চিঠি।

ট্রেনএখুনি একখানা আসছে, টেলিগ্রাম অর্ডার দিয়ে আনানো হচ্ছে। আপনি আপনার নার্স ও রোগী নিয়ে হ্যান্কাউতে এই ট্রেনে যাবেন; আপনাকে একথা বলার আদেশ আছে আমার ওপর। গুড নাইট।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। কেন হঠাৎ এ আদেশ জানেন?

—আমরা এই রেলের জন্যে আর লোকক্ষয় করবো না। জেনারেল চু-টে'র আদেশ এসেছে। হেড কোয়ার্টার্স থেকে। পরবর্তী যুদ্ধ হবে এর দশমাইল দূরে। আর এখুনি আপনারা তৈরী হোন। আজ শেষ রাতে জাপানীরা আড্ডা দখল করবে। তার আগে হয়তো গোলা ছুঁড়তে পারে।

প্রোফেসর লি কাছেই দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। তিনি বল্লেন—আমি এই ট্রেনে গরীব গ্রামবাসীদের উঠিয়ে নিয়ে যাবো। নইলে জাপানী বোমা থেকে যাও বা বেঁচেছে, গোলা আর হ্যান্ডগ্রিনেড খেলে তাও যাবে। আপনি দয়া করে আমার এই অনুরোধ কম্যান্ডান্টকে জানিয়ে আমায় খবর দিয়ে যাবেন?

ডেস্প্যাচ-রাইডার অঙ্ককারের মধ্যে অদৃশ্য হোল।

আরও দেড়ঘণ্টা পরে এল ট্রেন। ট্রেনখানা প্রায় খালি। তবে পেছনের গাড়ীগুলো সুটকি মাছে বোঝাই—বিষম দুর্গন্ধ। বিমল হাসপাতালের সব লোকজন নিয়ে ট্রেনে উঠলো—মিনি, এ্যালিস্, দুটি চীনা নার্স, সাত আটটি রোগী। প্রোফেসর লি ইতিমধ্যে তাঁর দলবল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু ট্রেনের সামরিক গার্ড কম্যান্ডান্টের বিনা আদেশে তাঁর দলবল গাড়ীতে উঠাতে চাইলে না।

এ্যালিস্ বল্লেন—বিমল, ওদের বলো তাহলে আমরাও যাবো না। ওঁকে ফেলে আমরা যাবো না।

ট্রেনের সামরিক গার্ড বল্লেন—আমার কোনো হাত নেই। আপনারা না যান, পনেরো মিনিট পরে আমি গাড়ী ছেড়ে দেবো।

এ্যালিস্ ও মিনি নামলো। চীনা নার্স দুটিও এদের দেখাদেখি নামলো। ট্রেনের গার্ড বল্লেন—রোগীরা কাদের চার্জে যাবে? একজন ডাক্তার চাই। আমি রিপোর্ট করলে আপনাদের কোর্ট মার্শাল হবে। আপনারা হাসপাতালের কর্মচারী, সামরিক আদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য।

বিমল বল্লেন—সে এঁরা নন—এই মেয়ে দুটি। এঁরা আমেরিকান রেডক্রস সোসাইটির। চীনা পার্লামেন্টের হাত নেই এদের ওপর।

এদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময় ডেস্প্যাচ-রাইডারকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ পরে প্রোফেসর লি তাঁর দলবল নিয়ে ছড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়লেন। ট্রেনও ছেড়ে দিল।

দিন পনেরো পরে।

হ্যানকাউ শহরের উপকণ্ঠে পবিত্র ফা-চিন্ মন্দির। মিং রাজবংশের রাজকুমারী ফা-চিন্ তাঁর প্রণয়ীর স্মৃতির মান রাখবার জন্যে চিরকুমারী ছিলেন—এবং একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মঠে দেহত্যাগ করেন একষষ্টি বছর বয়সে। তাঁর দেহের পুণ্য ভস্মরাশির ওপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিধারে অতি মনোরম উদ্যান ও ফোয়ারা।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এ্যালিস্ ও বিমল মার্বেলের চৌবাচ্চায় মন্দিরের অতি বিখ্যাত লালমাছ দেখাচ্ছিল। অনেক দূর থেকে লোকে এই লালমাছ দেখতে আসে—আর আসে নব-বিবাহিত দম্পতি—তাদের বিবাহিত জীবনের কল্যাণ কামনায়।

একটা গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে এ্যালিস্ ক্লান্তভাবে বসলো।

বিমল বল্লেন—মিনীরা কোথায়?

—মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। এখানে বসো। কেমন সুন্দর লালমাছ খেলা করছে দেখো। আমি কি ভাবছি বিমল জানো, এমন পবিত্র মন্দির, এমন সুন্দর শান্তি, এই প্রাচীন পাইন গাছের সারি—সব জাপানী বোমায় একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধের এই পরিণাম, প্রাচীন দিনের শান্তি ও সৌন্দর্য্যকে চুরমার করে বর্ষরতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

—এ্যালিস্, আর কতদিন চীনে থাকবে?

—যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, যতদিন একজন আহত চীন সৈনিকও হাসপাতালে পড়ে থাকে। যতদিন ড্যাডি লি তাঁর সাহায্যকারিণী মেয়ের দরকার অনুভব করেন।

এ্যালিস্ বিমলের দিকে চেয়ে বন্ধে—কিন্তু বিমল, ততদিন তোমাকেও তো থাকতে হবে—তোমাকে যেতে দেবো না।

পাইনগাছের ওদিকে নিকটেই প্রোফেসর লি'র প্রাণখোলা হাসি ও কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল।

এ্যালিস্ বন্ধে—ওরা এদিকেই আসছে।

এ্যালিসের ভুল হয়েছিল, মিনি আর সুরেশ্বর এল না—এলেন প্রোফেসর লি। এই বয়সেও তাঁর চোখের অমন অদ্ভুত দীপ্তি যদি না থাকতো, তবে তাঁকে জনৈক বৃদ্ধ চীনা রিক্‌শাওয়ালা বলে ভুল করা অসম্ভব হয় না—এমনি সাদাসিধে তাঁর পরিচ্ছদ।

প্রোফেসর লি বন্ধে—হ্যান্কাউ শহরে এসে আমার গরীব গ্রামবাসীরা আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে। কিন্তু গবর্নমেন্টের তেরি মাটির নীচের ঘরে লুকিয়ে থাকলে আমার চলবে না এ্যালিস্, আমি কালই এখান থেকে গ্রামে চলে যাবো।

এ্যালিস্ বন্ধে, কেন?

—দক্ষিণ চীনে সর্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ। লোক না খেয়ে মরছে, তার সাথে বোমা আছে। মড়ক লেগেছে। আমার এখানে বসে থাকলে চলে? আমি আবেদন পাঠিয়েছি আমেরিকায় মার্কিন রেডক্রস সোসাইটির মধ্যস্থতায়। তারাই আপেল পাঠিয়েছিল এদের খাওয়াতে। যতদূর জানা গিয়েছে, ওরা কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে। টাকাটা শীগগির আসবে।

এ্যালিস্ বন্ধে—ড্যাডি, আমার একটা প্রস্তাব শুনবেন? আমার মাসীমা নিঃসন্তান, বিধবা, অনেক টাকার মালিক। আমায় তিনি উইল করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন, টাকাটা আমি চাইলেই পাবো। সেই টাকা আপনাকে দিচ্ছি—হ্যান্কাউ শহরে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের জন্যে একটা 'হোম' খুলুন। আপনি লেখালেখি করলে গবর্নমেন্টও কিছু সাহায্য করবে। আমি আর মিনি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করবো।

প্রোফেসর লি বন্ধে—তোমায় ধন্যবাদ, এ্যালিস্ অতি দয়াবতী মেয়ে তুমি, কিন্তু তোমার টাকা নেবো না। তা ছাড়া এমন কোনো বড় আশ্রয়স্থল আমরা গড়তে পারবো না, যাতে সকল দুঃস্থ বালক-বালিকাদের আমরা জায়গা দিতে পারি। সারা দক্ষিণ-চীন বিপন্ন, কত ছেলেমেয়েকে আমরা পুষতে পারি? মাঝে মাঝে তোমার টাকাগুলো যাবে।

বিমল একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এ্যালিসের ওপর প্রোফেসর লি'র স্নেহ নিজের সন্তানের ওপর পিতার স্নেহের মতোই। উনি চান না এ্যালিসের টাকাগুলো খরচ করিয়ে দিতে। নইলে উনি 'হোম' গঠনের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখালেন, সেটা এমন কিছু জোরালো নয়। সব দুঃস্থ লোকদের আশ্রয় দিতে পারছিনে বলে তাদের মধ্যে কাউকেও আশ্রয় দেবো না!

এমন সময়ে সুরেশ্বর ও মিনি এসে বন্ধে—এসো এ্যালিস্, এসো বিমল, একটা জিনিস দেখে যাও।

ওরা বাগানের বেঞ্চি থেকে উঠে মন্দিরের উঁচু চত্বরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দেখলে, ওদের আগে আগে দুটি চীনা তরুণ-তরুণী মন্দিরে উঠছে। তাদের হাতে ছোট ছোট ধ্বজা, মোমবাতি ও ফুল।

মিনি বন্ধে—ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ছেলেটি বেশ ইংরাজী জানে। ওর ডাক পড়েছে যুদ্ধে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে ওই মেয়েটিকে কাল বিয়ে করেছে; অনেকদিন থেকে মেয়েটি ওর বাগদত্তা। ফা-চিন্ মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে এসেছে—

বিমল ও এ্যালিস্ নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিউরে উঠলো। বর্তমান যুগের ভীষণ মারণাস্ত্রের সামনে যুদ্ধ! আয়ু ফুরিয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। একটা বোমার অপেক্ষা মাত্র। তরুণীর বয়স অল্প—ষোলো সতেরো।

চীন দেশে সম্প্রসৃত-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নেই।

তরুণ-তরুণীর মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময়। কোনদিকে ওদের লক্ষ্য নেই। মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে মোমবাতি জ্বলছে। ওরা খোদাই করা কাঠের চৌকাট পার হয়ে রাজকুমারী ফা-চিন-এর কৃত্রিম সমাধির সামনে মোমবাতি

জ্বালিয়ে দিলে, ফুল ছড়িয়ে দিলে, দুজনে পাশাপাশি বসে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে। তারপর ওরা উঠলো—ঘর থেকে বাইরে এসে মন্দিরচত্বরে দাঁড়ালো, দুজনে দুজনের হাত ধরে আছে—দুজনের হাসি-হাসি মুখ।

এ্যালিস্ বন্ধে—মিনি, ওঁদের এখানে দাঁড়াতে বলো না? আমাদের অনুরোধ—

মিনি বন্ধে—আপনারা একটু দয়া করে যদি দাঁড়ান—মন্দিরের চত্বরে—

যুবক ওদের দিকে হাসিমুখে চাইলে, তারপর মেয়েটিকে চীনাভাষায় কি বন্ধে। তরুণীও অল্প হাসিমুখে ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে চোখ নীচু করলে।

যুবক হাসিমুখে বন্ধে—ফটো নেবে বুঝি? আলো নেই মোটে—ফটো উঠবে?

এ্যালিস্ এই সময় মন্দিরের বাইরের ফুলের দোকান থেকে একরাশ ফুল কিনে নিয়ে এল। বৃদ্ধ লি'কেও সে ডেকে এনেছে বাগান থেকে। হাসিমুখে বন্ধে—ড্যাডি, এই ফুল নিয়ে ওদের আশীর্বাদ করুন—তোমরাও সবাই ফুল নাও।

যুবকের সঙ্গে প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় কি কথাবার্তা বন্ধে, তারপর সকলে অর্ধচক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো নবদম্পতিকে।

প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় গম্ভীর স্বরে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করে ওদের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিলেন—তারপর সকলে ফুল ছড়ালে ওদের ওপর। এ্যালিস্ ও মিনির কি হাসি ফুল ছড়াতে ছড়াতে।

তরুণ-তরুণী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলো—সন্ধ্যা নেমেছে। কোথাও আর রোদ নেই—এই পবিত্র, প্রাচীন ফা-চীন মন্দির, পাইন বন, লাল মাছের চৌবাচ্চা, শান্ত গম্ভীর সন্ধ্যা—এই কলহাস্যমুখরা বিদেশিনী মেয়ে দুটি,—এই নবদম্পতী। দেখে মনে হয় না এই পবিত্র স্থানের তিন মাইলের মধ্যে মানুষ মানুষকে অকারণে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে বিষবাষ্প দিয়ে, বোমা দিয়ে, কলের কামান দিয়ে। যুদ্ধ বর্ষের ব্যবসায়। অথচ এই হাসি, এই আনন্দ, তরুণ দম্পতীর কত আশা, উৎসাহ!

এ্যালিস্ ঠিকই বলেছে। সব যাবে—কাল সকালেই হয়তো যাবে, জাপানী বোমায়। পবিত্রফা-চিন্ মন্দির যাবে, পাইন গাছের সারি যাবে, লালমাছ যাবে, এই তরুণ দম্পতী যাবে, সে যাবে, মিনি, এ্যালিস্, সুরেশ্বর, বৃদ্ধ লি—সব যাবে। যুদ্ধ বর্ষের ব্যবসায়।

ফুল ছড়ানো শেষ হয়েছে। মন্দিরের বাঁধানো ঢালু ছাদে পোষা পায়রার দল উড়ে এসে বসেছে। পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটা ফুলে ভর্তি। নবদম্পতী তখন হাসছে—এ একটা ভারি অপ্রত্যাশিত আমোদের ব্যাপার হয়েছে তাদের কাছে। ওদের হাসি ও আনন্দ যেন দানবীয় শক্তির ওপর,—মৃত্যুর ওপর,—মানুষের জয়লাভ। মহাচীনের নবজন্ম হয়েছে এই তরুণ-তরুণীতে। স্বর্গ থেকে ফা-চিন্-এর পবিত্র অমর আত্মা ওদের আশীর্বাদ করুন।

এ্যালিস্ এসে বিমলের হাত ধরলো।

—চল যাই বিমল। হাসপাতালে ডিউটি রয়েছে—তোমার আমার এম্ফুনি—